KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকর	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5-6	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৮৫ আশ্বিন, ১৩৮৫ কার্তিক, ১৩৮৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ পৌষ-মাঘ, ১৩৮৫ Condition : Brittle / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় রায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম বর্ষ, **পত্রিকা** কার্ত্তিক
তৃতীয় সংখ্যা সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র ১৩৪৬

দৃষ্টি

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আমাদের চোখে একটি 'লেনস্' আছে। মুশুরির ডালের মত পেটমোটা একটি স্বচ্ছ জলভরা থলি। সেইটে আমাদের নয়নের স্ফটিকমণি। আলোর রশ্মিগুলি তার ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে চোখের অন্তস্তলে 'রেটিনা' বা স্নায়ুগুচ্ছের ঝিল্লিপটে ছায়াঙ্কপাত করে। আলোকের স্পর্শানুভূতি দৃষ্টি হয়ে ফোটে আমাদের চেতনায়। চোখের দেখা সেই বাইরের প্রতিফলিত ছায়াচিত্রের প্রতিকৃতি। ফটোগ্রাফির ক্যামেরা-যন্ত্রটি আমাদের স্থূলচক্ষুর নিতান্ত খেলো অনুকৃতি মাত্র। চোখ যা দেখ্‌ল, মন তাকে নিয়ে স্মৃতি দিয়ে কল্পনা দিয়ে ভানুমতীর ভেল্‌কি খেলে। এই চাক্ষুষ দেখাটাই আমাদের অন্তর্দৃষ্টির মূলধন। জন্মান্ধের চোখে দৃশ্যজগতের অপূর্ব্বলীলার কোনো ছায়াচ্ছবি ফোটে না, সেই সঙ্গে তার চিন্তায় কল্পনায় বিশ্বসৃষ্টি বর্ণরেখাঙ্কহীন।

মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন তাকে নানা রোগে ধরে, দেহের কলকব্জাগুলো যায় বিগ্‌ড়ে। বার্দ্ধক্যের একটা বিষমব্যাধি চোখে ছানি পড়া। চোখের মণিবিন্দুতে যে লেন্‌সের কথা বললাম, সেটা ঘোলাটে হয়ে গিয়ে হয় অনচ্ছ, তার ভিতর দিয়ে আর আলো প্রবেশের পথ পায় না। চোখের সবই ঠিক আছে তবু সেই বুড়ো হয় চোখ থাকতে কানা। চোখের পাকা ডাক্তার যিনি, তিনি নিপুণ অস্ত্রোপচারে সেই নিরেট অস্বচ্ছ মটরটি বে'র করে' ফেলেন, আর বৃদ্ধের নাকে এঁটে দেন কাচের চশ্‌মা। যে কাজটা চোখের সহজাত লেন্‌সের দ্বারা চলত, এখন কাচের পর্‌কলার সাহায্যে সে কাজ মোটামুটি বেশ চলে, স্থবিরক ফিরে পায় তার দৃষ্টি। আমাদের অনেকদিনের প্রাচীন সভ্যতা আজ হয়েছে বৃদ্ধ। বহুকাল ধরে' তার বহির্দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ। একদা তার চোখে ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এবং সে দৃষ্টিকে অন্তরের ধ্যানধারণা দিয়ে সে উদ্ভিন্ন করেছিল তার কাব্যে দর্শনে আয়ুর্বেদে ধনুর্বেদে শিল্পকলায়। কালক্রমে তার ঘটল দুর্বুদ্ধি। বাহিরকে, প্রত্যক্ষকে স্বীকার করবার যে সহজ বুদ্ধি, সে বুদ্ধিটার হ'ল ব্যতিক্রম। সেই সঙ্গে আমাদের অন্তর্দৃষ্টিও ক্রমে হয়ে এল ঝাপ্‌সা। উপনিষদের ঋষিদের সহজ সরল দৃষ্টি সাংখ্য-পাতঞ্জলের প্রাঞ্জল বিচারবুদ্ধি পৌরাণিক যুগে কি হয়ে দাঁড়ালো এবং তদুত্তর কালে আমাদের ধর্ম্মে আচারে প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে পরস্পরের ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে কি যে বিভ্রাট পাকিয়ে তুললো তার ফলভোগী আজ আমরা আপামর সাধারণ সকলেই।

নিসর্গ চক্ষুচিকিৎসক। 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া' আমাদের চোখের ছানি যখন কাটেন তখন

নতুন চশ্‌মা নাকে এঁটে নতুন চোখে আবার সংসারটাকে দেখতে শিখি। এই কৃত্রিম আনুকূল্যে যে দৃষ্টিটা অপস্রয়মান যুগের অন্তিম চক্ষে ফোটে, আগামী যুগে সেইটাই সহজ দৃষ্টি হ'য়ে উত্তরকালের তরুণদের চোখের আলো হয়। অস্তোন্মুখী যুগান্ত যে কুঙ্কুমরঞ্জনা পশ্চিম গগনে মাখিয়ে যায়, সেই অরুণরাগই আবার ফুটে ওঠে পূর্ব্বাশার উদয়শিখরে। যেন আকাশের কোন্ গোপন সুড়ঙ্গপথে পশ্চিমের তাম্ররবি পুনশ্চ দেখা দেয় তাম্রদীপ্তিতে পূর্ব্বাচলের গুহার মুখে।

মানুষ জীবনের ক্ষেত্রে স্বয়ংস্রষ্টা। আমরা বিশ্বকে ও পরস্পরকে যে চক্ষে দেখি তার উপর আমাদের আত্মরচনা নির্ভর করে। বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। এ পরিবর্ত্তন যেমন অভিনব তেমনি দ্রুত। জীবরাজ্যে প্রকৃতির বিবর্ত্তন পদ্ধতিটি নিতান্ত মন্থর। কোটিকল্পব্যাপী তার অভিব্যক্তির ক্রমপরম্পরা। আমাদের এই স্বল্পায়ু জীবনেও নিজ সৃষ্টিলীলা চলে ধীরবিলম্বিত ছন্দে। রক্ষণশীল আমাদের রচনা। নদীর মত পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর বাধাবন্ধ, উচ্চনিচতা, আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম ও সন্ধি করতে করতে অগ্রসর হয় মানবেতিহাসের ধারা। কেবল মাঝে মাঝে যখন তার মুক্তগতি রুদ্ধ হয় তখন জাগে বিপ্লব। স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিমূলে জাগে ভাঙনের মড়্‌মড়ানি। এইটেকেই বলেছি নিসর্গের অস্ত্র চিকিৎসা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

গীতার এই শ্লোকটিতে কেন্দ্রীভূত বিশ্বমানবাত্মার মর্ম্মবাণী উৎসারিত হয়েছে অমোঘমন্ত্রে। মানুষের আত্মিক ধর্ম্ম অগ্রগতি। এই আবেগ যখন স্তম্ভিত হয়, তখন কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবনে, অধর্ম্মের গ্লানি ও পঙ্ক পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণে উদ্ভূত হন প্রলয়ঙ্কর শঙ্কর বন্দীমানবের রুদ্ধশ্বাস বক্ষে।

মুক্তির জন্য আকুলতা আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এর মূলে রয়েছে নবতর দৃষ্টিভঙ্গী। নতুন আদর্শ যাঁদের জীবনে অধিগত হয়েছে, কেবল বাক্যে নয়, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে বিশিষ্ট রূপ ও গতি লাভ করেছে, তাঁরাই যুগে যুগে প্রবর্ত্তক। মানুষের মধ্যে এঁরাই এঞ্জিন্-মার্কা, আপন আবেগে ছুটে চলেন, আর যারা এঁদের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ হয় তাদেরও টেনে নিয়ে চলেন। বাদ বাকী আর সব চালিত হয়, চলে না।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক হাইগেন্সের একটি মতবাদ আছে, আলোকরশ্মির বিকীরণ প্রক্রিয়াকে বিশদ করবার জন্য। তিনি কল্পনা করেন চরাচর ঈথর-সমুদ্রে নিমগ্ন। এই মহাসাগরের কোথাও একটি বিন্দুতে যদি কম্পন জাগে, তাহলে তাকে কেন্দ্র করে' তার চারিদিক ঘিরে একটি তরঙ্গ-গোলকের উদ্ভব হয়। সেই তরঙ্গ-কন্দুকের প্রত্যেক বিন্দুটি আবার স্বতন্ত্র স্পন্দন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের প্রত্যেকটি অবলম্বন করে' ছোট ছোট ঢেউ-এর বিশ্ব ফুটে ওঠে। ফলে দাঁড়ায় এই, প্রথম যে গোলকটি স্পন্দমান বিন্দুকে অবলম্বন করে' ফুটে উঠেছিল, তার গায়ে ছোট ছোট ফোস্‌কার মত অসংখ্য বুদ্‌বুদ ফুটে ওঠে এবং তারা একাকার হয়ে গিয়ে প্রথম গোলাকার ঢেউটিকে আরও ফুলিয়ে তোলে। যেন একটা সাবানের ফেনার বিশ্ব শূন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ফুলতে লাগল, আর ঈথর-সমুদ্রে এই স্ফীতি দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে চলল।

এই কৌশলে শুধু যে আলোক বা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চতুঃপার্শ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় তা নয়, প্রত্যেক সজীব হৃদয়ের প্রাণস্পন্দ বুঝি এই নিয়মেই জনসমাজে প্রসারিত হয়ে যায়। খ্রীষ্টের প্রাণে যে স্পন্দন জাগল, সেটি সঞ্চারিত হ'ল জুডিয়ার জেলেমালার দলে। তারা তাঁকে ঘিরে একটি মণ্ডলী বা চক্র রচনা করল। এই চক্রের অন্তর্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তিই আবার প্রবর্ত্তকের আদর্শ ও মহদ্ভাবের প্রচার কেন্দ্র হলেন, দিকে দিকে খ্রীষ্টধর্ম্মের চক্রবাল প্রসারিত হয়ে চলল দেশ হ'তে দেশান্তরে, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে। হাইগেন্সের এই পরিকল্পনাটি কেবল আলোক বিকীরণের রহস্যকে প্রাঞ্জল করে না, সর্ব্বপ্রকার আবেগধর্ম্মী ভাবপ্রচারের ওই একই পদ্ধতি।

গণ্ডীর উপর সঙ্ঘের উপর আমার অগাধ আস্থা, যদি এই মণ্ডলীর মূলে যথার্থ আন্তরিকতা থাকে। সমভাবাপন্ন সমরসে রসিক আত্মীয় সমবায় অমেয় শক্তির কেন্দ্র। দু'য়ে দু'য়ে চার হয় আঙুল গুনে, কিন্তু সহানুভূতি-সম্বদ্ধ সমপ্রাণ হৃদয়ে হৃদয়ে যখন গোষ্ঠিবন্ধন হয়, তখন সেই আন্তরিক ঐক্য সৌহার্দ্দ্যের পুঞ্জীভূত শক্তির পরিমাপ অপ্রমেয়, সংখ্যার অনুপাতে নয়।

আমাদের চরণচারণা যেটুকু সীমানার মধ্যে আবদ্ধ তাকে অতিক্রম করে' বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় আমাদের দিগন্তপ্রসারিণী দৃষ্টি। অধুনাকে আবেষ্টন করে' রয়েছে ভবিষ্যের দিক্‌চক্রবাল আমাদের উৎসুক দৃষ্টিতে। অনাগতের ছায়াম্পাত পড়ে এই বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে। সাহিত্য আগামীর ছায়াদূত। সাহিত্য যতই বস্তুতান্ত্রিক হোক না কেন, তার ভিতর ভাবী সম্ভাবনার বীজ যদি নিহিত না থাকে তবে তা নিতান্তই নিষ্ফল। সূর্য্যালোকের সঙ্গে থাকে যেমন অদৃশ্য রাসায়নিক রশ্মি তেমনি সাহিত্যের বাক্‌প্রাচুর্য্যের মধ্যে তার অনির্ব্বচনীয়তা-টুকুই সব চেয়ে বাণীময় ও রসাত্মক।

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। প্রত্যক্ষের সঙ্গে তার কারবার যুক্তি বিচারের সাহায্যে। জড় ও চেতনকে আজ আমরা নতুন চোখে দেখতে শিখেছি পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে। বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে আমাদের "চিরপরিচয় মাঝে নবপরিচয়ের" সূত্রপাত হয়েছে।

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা জীবের প্রাণধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগান্তে আমরা অন্নসমস্যার মীমাংসায় উপনীত হয়েছি সোশালিজমের নানা ঘাঁটিতে এবং নরনারীর নিগূঢ় সম্বন্ধের ভিতর পারস্পরিক শ্রদ্ধাসাম্য ও স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকার করতে ধীরে ধীরে বদ্ধপরিকর হচ্ছি। পুরানো বোতলে নতুন মদ ঢালতে গিয়ে আধারটা ফেটে হয়েছে চৌচির। নূতন পরিস্থিতির সুব্যবস্থা হবে তাঁদের হাতে যাঁরা ভাঙ্‌বেন কেবল গড়বার প্রেরণায়। ফুটবল খেলায় পশ্চাতের খেলুড়ে সম্মুখের ঘাঁটিদারের পায়ের কাছে বলটা গছিয়ে দিয়ে তার অগ্রগতিকে ক্রম-পরম্পরায় 'গোলের' লক্ষ্যমুখে প্রধাবিত করে। জাতীয় নবজীবনের প্রবর্ত্তনায় অগ্রপশ্চাতের ঐক্যবন্ধন এইরূপে প্রাচীন নবীনের সহযোগিতায় সহজ হয়, নতুবা একটা বিপ্লবের ধ্বংসস্তূপ থেকে নবসৃষ্টির উদ্বোধন অনিবার্য্য।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' সাহিত্য সাধনার অন্তর্গূঢ় ভাবনাটি কি, এই প্রশ্নের সদুত্তরের উপর নির্ভর করবে সাহিত্যসাধকের সৃজন-বৈদগ্ধ্য।

এ-যুগের কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

কীট্‌স্ যে একবার বলেছিলেন, পৃথিবীতে কবিতার শেষ নেই, তাঁর এ-মন্তব্যের ভিত্তি ছিলো শীতের কৃজনহীন কাননে দুটি পোকার গুঞ্জন। কিন্তু কথাটির প্রয়োগ আরো বেশি ব্যাপক ব'লে মনে হয়। ১৮২১-এ মারা না-গিয়ে কীট্‌স্‌ই যদি কায়াকল্প বা অন্য-কোনো জাদুবলে ১৯২১ পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে পৃথিবীতে অজস্র নতুন কাব্যময় বস্তু আবিষ্কার ক'রে তিনি চমৎকৃত হ'তেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকেও এ-পৃথিবী ছিলো কবির চিরকালের লীলাভূমি—অর্থাৎ সেখানে ফুল ফুটতো, পাখি ডাকতো, চাঁদ উঠতো আকাশে। কিন্তু এ-যুগে, ভারতবর্ষের মতো অনগ্রসর দেশেও, প্রকৃতির যে-ঐশ্বর্য বিনামূল্যে বিতরিত, তা থেকে আমরা প্রায় সকলেই বঞ্চিত। আমরা যারা কলকাতায় থাকি, আমাদের পক্ষে চাঁদের অস্তিত্ব নেই, ফুল আছে নিউ মার্কেটের ষ্টলে, চড়া দামে বিকোয়, আর পাখির গান যে রূপকথা নয়, সে-বিষয়ে সচেতন হবার কারণ আমাদের জীবনে বড়ো ঘটে না। উনিশ শতকী রোমান্টিসিজ্‌ম্-এর শেষ মহৎ কবি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির অফুরন্ত লীলার মধ্যে বাসা নিলেন শান্তিনিকেতনে, সেখানে গড়লেন আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার সঙ্গে চিরন্তনী প্রকৃতির অপূর্ব সমন্বয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাত্ত্বিক সৌভাগ্য সকলের হয় না: জ্যোছনা কি অন্ধকার দেখতে, পাখির গান কি পোকার ডাক শুনতে আমাদের যেতে হয় রেলগাড়ি চেপে দু'শো, তিনশো, পাঁচশো মাইল দূরে, যদি অবশ্য মাশুল জোটে।

কিন্তু তাই ব'লে কি আমাদের জীবনে কবিতার সব উৎসই রুদ্ধ হ'য়ে গেছে? না, কীট্‌স্ ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীতে কবিতা মৃত্যুহীন। বিভিন্ন ঋতুর উপঢৌকন আমরা যদি আংশিকরূপে হারিয়ে থাকি, যন্ত্র এনে দিয়েছে বিবিধ নতুন উপহার। কবিতাকে ধ্বংস করা দূরে থাক্, যন্ত্র নিজেরই অজ্ঞাতে কবিতার তাঁবেদারি করছে। আমি বলতে চাই যে কোনো-কোনো যন্ত্র আমাদের মনকে ঠিক সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়, পাখির কি পোকার আওয়াজে কীট্‌স্-এর মনের যে-অবস্থা হ'তো। কীট্‌স্-এর মন্তব্যটি যখন ধ্বনি-সংক্রান্ত, তখন আমাদের যে-সব অভিজ্ঞতার প্রবেশ-পথ কান, সেগুলোর কথাই প্রথমে ধরা যাক্। আধুনিক যুগে যে-সব কবিতা-সঞ্চারী শব্দ আমরা উপভোগ করছি, প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে লোকের তা কল্পনার অতীত ছিলো। অবশ্য কিছু ক্ষতিও আমাদের হয়েছে—যেমন ঘোড়ার পায়ের শব্দ কি ঢেঁকির ওঠা-পড়া আজকাল আর সাধারণত আমাদের শোনবার উপায় নেই; কিন্তু এ-বিষয়ে ব্যালান্স-শীট তৈরি করলে হয়তো দেখা যাবে লোকসানের চেয়ে লাভের অঙ্কই কিছু মোটা।

নিচে আমি শব্দের যে তালিকাটি পেশ করছি, প্রত্যেক পাঠকই তা নিজের রুচি ও

অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তবে আমার বিশ্বাস আমার উল্লিখিত আওয়াজগুলোর কবিতাবাহী গুণ সম্বন্ধে কোনো মতদ্বৈধ হবে না।

২

অনেক রাত্রে, এই অশান্ত শহরও যখন চুপচাপ হ'য়ে আসে, তখন ডায়মণ্ড হার্বরের লাইন দিয়ে দু'একটি রেলগাড়ি যাওয়া-আসা করে। বিছানায় শুয়ে, ঘুমের আগে আমি একটি মন্থর, একটানা, চাপা শব্দ শুনি। সুখের বিষয়, আমার বাস রেল-লাইনের একেবারে ধারে নয়, তাই এই শব্দের কর্কশতা আমি টের পাইনে; কানে যা আসে তা যেন বিরল একটা বিলাসিতা, এতই সস্নেহ ও কোমল যে ছোঁবার জিনিস হ'লে একে মখমলের সঙ্গে তুলনা করতুম। বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার দিক থেকে, বেশিরাত্রে দূরের রেলগাড়ির শব্দ ঝিঁ-ঝিঁপোকার ডাকের চাইতে কম মূল্যবান মোটেই নয়। এ-শব্দ শুনতে-শুনতে মনের অনেক রুদ্ধঘরের দরজা খুলে যায়; কল্পনা জেগে ওঠে; এবং এক্ষুনি, এই একটু পরেই, এর ক্ষীণতম রেশটুকু পর্যন্ত দূরের হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, এ-কথা জানি ব'লেই ক্ষণিকের উপভোগ হয় অতি তীব্র।

রেলগাড়ির ছুটো ভাষা আছে: এই একটা যা শুনি মাঝ-রাতে বিছানায় শুয়ে, আর-একটা শোনে যাত্রীরা, রেলগাড়ি যখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ কি ষাট মাইল বেগে মাঠের পর মাঠ, পাহাড়ের পর পাহাড় পার হ'য়ে চলেছে। তখনো রেলগাড়ি কর্কশ নয়; তার ঘূরন্ত চাকাগুলি একটি নির্দিষ্ট ও নিভুল ছন্দের জন্ম দেয়। বর্ধমান থেকে আসানসোল যেতে-যেতে সে-ছন্দ আপনার কান থেকে মগজে, মগজ থেকে রক্তে প্রবেশ করে, অর্থাৎ আপনার নেশা ধ'রে যায়। তখন—আপনি যদি কবি হন—এ-কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে, আহা, এই ছন্দ যদি মানুষের ভাষায় চালান করা যেতো! আপনি যদি বাজে কবি হন, তাহ'লে বাড়ি পৌঁছিয়ে হয়তো একটি পদ্য লিখেও ফেলবেন, তার দু'চার লাইন আমিই না-হয় আপনাকে শোনাচ্ছি—

খটাখট খটাখট,
ঐ গেলো চুঁচড়ো,
রিশড়া, শ্রাওড়াপুলি
ওরা সব খুচরো—
পাইকেড়ি কারবারি—
হুশ হুশ গুম্ গুম্,
কাল রাতে দিল্লীতে—
একটুও নেই ঘুম।

কিন্তু আপনি যদি ভালো কবি হন, তাহ'লে আপনি জানবেন যে গানের মধ্যে যেমন কুহু-কুহু ব'লে চেঁচিয়ে উঠলেই কোকিলের গান শোনানো হয় না, কবিতাতেও তেমনি খটাখট হুশহুশ বললেই রেলগাড়ির ছন্দকে ধরা যায় না। আক্ষরিক অনুকরণে বস্তুর স্বরূপ ফোটে না। অনোমেটোপীআর ঠকমকিতে শিশুর কান ভোল, বয়স্কের মন বিরক্ত হয়। না, রেলগাড়ির ছন্দ

কবিতায় চালান করা সহজ নয়। এবং এ-কাজ ব্যক্তির নয়, সমবায়ের, সচেতন নয়, অচেতন। বহু পূর্বে, যখন মানুষমাত্রেই ছিলো কৃষক, তখন বীজবপনের কি ধান-কাটার সমবেত কাজগুলির বিশেষ একটি ছন্দ ছিলো, সেই ছন্দই সঞ্চারিত হয়েছে মানুষের আদিম কবিতায়। সভ্যতার বিচিত্র প্রগতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মানুষের কবিতায় সেই কৃষি-যুগের ছন্দই রাজত্ব করছে। যন্ত্র-যুগ তো সদ্যোজাত, এ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন হয়তো কবিতার মূল ছন্দটি হবে টরবাইন-এঞ্জিনের ছন্দ। একজন পাশ্চাত্য কাব্যসমালোচক, অন্তত, এই মর্মে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

৩

এবার পুজোর ছুটিতে যেখানে গিয়েছিলুম, সে-শহরের ইলেকট্রিক পাওঅর-হাউসের ঠিক পাশেই ছিলো আমাদের বাসা। প্রথমটায় মন-খারাপ লেগেছিলো, কিন্তু দু'দিন যেতেই বুঝলুম, ডাইন্যামোর শব্দটা বিশেষ বিরক্তিকর নয়। দিনের বেলায় অবশ্য লক্ষ্যই করতুম না, কিন্তু অবাক হলুম, যখন রাত্তিরে শুয়ে সেই ক্লান্তিহীন, একঘেয়ে শব্দ আমার আগতপ্রায় স্বপ্ন-গুলির খেলার সঙ্গী হ'য়ে উঠলো। আমার যদি কবিত্বের প্রতিভা থাকতো, তাহ'লে এ-বিষয়ে একটি সনেট রচনা করা আমার পক্ষে শক্ত হ'তো না। রাত্রির হৃদয়ের মধ্যে অন্য-একটি হৃৎপিণ্ড অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়া সত্যি ভারি মধুর। দূরের রেলগাড়ির শব্দ এক্ষুনি মিলিয়ে যাবে এই চেতনা যেমন আমাদের ক্ষণিক উপভোগকে ধারালো করে, তেমনি ডাইন্যামোর শব্দ কখনো থামবে না জানি ব'লেই সমস্ত শরীর-মন গভীর আরামে যেন গ'লে যায়। যে-শব্দের পুনরুক্তি হয়, অথচ সে-পুনরুক্তি অনিয়মিত, তা আমাদের স্নায়ুর বিকার ঘটায়; যেমন কি না, রাস্তায় যদি একদল লোক হল্লা করতে থাকে, তাহ'লে ঠিক কোন্ সময়ে আবার অট্টহাসি শোনা যাবে, সেই চিন্তাই আমাদের ঘুম কেড়ে নেয়। সে-ক্ষেত্রে মানসিক উৎকণ্ঠাই শারীরিক কষ্টকে ছাপিয়ে ওঠে। যন্ত্র অনেক সময় অসহ্যরকমের কর্কশতা সৃষ্টি করে তা যেমন সত্য, তেমনি এ-ও সত্য যে প্রায় সব যন্ত্রেরই সাধারণ গতি একটি ছন্দে বাঁধা, অপরিচয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলে সে-ছন্দ আমাদের মনের ঘুমুনো কল্পনাকেই জাগিয়ে তোলে। এ-বিষয়ে ফাস্ট্ প্রাইজ নিঃসংশয়ে প্রাপ্য ষ্টিমারের শিঙার, যদি যথেষ্ট দূর থেকে শোনা যায়। রেলের ভেঁপু বড়োই চপল, কারখানার বাঁশির আওয়াজে হুকুমের ভাবটা ভালো যায় না, কিন্তু ষ্টিমারের শিঙা এমনই গম্ভীর, উদার ও রহস্যময় যে মুহূর্তে সে আমাদের মনকে ঘর-ছাড়া করে। মনে হয় লেপের তলা থেকে উঠে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি সমুদ্র পার হ'য়ে কোনো দ্বীপপুঞ্জের দিকে; মুহূর্তে মগজের মধ্যে পৃথিবীর নীল মানচিত্র বোঁ ক'রে ঘুরে ওঠে।

সত্যি, পৃথিবীতে কবিতার শেষ নেই।

৪

এই তো গেল শুধু শব্দের কথা। এ ছাড়া দৃশ্যবস্তুর কথা যদি বলেন, তাহ'লেও দেখা যাবে গত দু'শো বছরে আমাদের কাব্য-চেতনায় অনেক নতুন ও অদ্ভুত জিনিসের আমদানি হয়েছে। প্রকৃতির মুখের উপর মানুষের কারিগরি আজ এমনি ব্যাপক যে তা থেকে মুখ ফেরানো

প্রায় অসম্ভব। এর ফল, নিছক সৌন্দর্যের দিক থেকে, কেবলই খারাপ হয়নি। গঙ্গার দু'দিকে যখন কেবল ধোঁয়া-উগরোনো চিমনির সারি দেখা যায়, তখন অবশ্য মনখারাপ হয়, কিন্তু কলকাতার গঙ্গার ঘাট, যেখানে দেশ-বিদেশের জাহাজ ভেড়ে, তার একটি সৌন্দর্য নিশ্চয়ই আছে, কবির চোখ যার আছে সে-ই তা দেখতে পায়। 'ছিন্নপত্রে' বর্ণিত নদী থেকে তার জাতই আলাদা, কিন্তু সে-ও সুন্দর। উনিশ-শতকী রোমান্টিকরা এটাই ভুল করতেন, যন্ত্রের স্পর্শে কুশ্রীতাই শুধু জন্মে না, নতুন ধরণের সৌন্দর্যও দেখা দেয়। এবং কুশ্রীতা যেটুকু, তার জন্যেও দায়ী বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের অভাব। অর্থাৎ, যথেষ্টরকম বিজ্ঞান প্রয়োগ না-করবার জন্যেই যান্ত্রিক পরিমণ্ডল অনেক সময় দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। কারখানা-অঞ্চলে সব চেয়ে নয়নপীড়ন জিনিস মজুরদের বস্তিগুলি, এবং সেগুলি সুন্দর করা মানুষেরই হাত। আরো বেশি নিবিড় ও ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান প্রয়োগ করিতে যদি আমরা রাজি হই, তাহ'লে স্থাপত্যের কুশ্রীতা অন্তত পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবে। আমরা যদি সত্যি সত্য হতুম তাহ'লে কারখানার মালিকদের বাধ্য করতুম সমস্ত বাড়িঘর সুদৃশ্য করতে। আরাম, সুলভতা, স্বাস্থ্য ও সুশ্রীতা—এতগুলি সদ্‌গুণের সমন্বয় আধুনিক স্থাপত্যই সম্ভব করেছে, এত বড়ো সুবিধে আমরা যদি গ্রহণ না করি সে আমাদেরই মূঢ়তা। একটা বিষয়ে শুধু খটকা থাকে: কারখানার চিমনি। ঐ বস্তুটা আমার অন্তত দু'চক্ষের বিষ। প্রাকৃত শ্রীর এত বড়ো শত্রু আর বোধ হয় উদ্ভাবিত হয়নি। ফাঁকা মাঠের মধ্যে আকাশের দিকে উদ্ধত ওর চেহারাটা চোখে পড়লেই মনে হয়, বহুদিন ধ'রে বহুযত্নে রচিত একটি সৌন্দর্যের প্রাসাদ একসঙ্গে হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো। অথচ চিমনি বাদ দেয়া যায় না, অন্তত কয়লার ব্যবহার যতদিন প্রচলিত আছে। একমাত্র আশা কয়লার বদলে বিদ্যুৎশক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ।

চিমনিটা অসহ্য ঠিকই; কিন্তু রাত্রে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে ব'সে কে না স্বীকার করবে যে যন্ত্র এ-জগতে নতুন ধরণের একটি সৌন্দর্য এনেছে? তারা-ভরা রাত্রি দেখে হপকিন্স্-এর যে-উচ্ছ্বাস, আলোর বিচিত্র উক্তি-পরানো কালো জল দেখে সে-উচ্ছ্বাসই আধুনিক কবির পক্ষে অসঙ্গত হবে না। আর কী গম্ভীর, বলশালী একটি শ্রী নিয়ে, জাহাজগুলি দাঁড়িয়ে! শক্তির বিশ্রামও কত সুন্দর, নোঙর-বাঁধা জাহাজগুলি দেখেই তা বোঝা যায়। তারপর ধরুন, একখানা বেশ বড় আকারের জবরদস্ত রেলের এঞ্জিন দেখে আমার তো রীতিমতো রোমাঞ্চ হয়। এমন পরিচ্ছন্ন, বাহুল্যবর্জিত, কঠোর পুরুষালি সৌন্দর্য আর কোথায় আপনি পাবেন! ও যে মানুষের এত বড়ো কাজে লাগে, সেটাই যেন ওর রূপ! কার্যকারিতা আর সৌন্দর্যের বিরোধ আসলে একটা কুসংস্কার। পুরাকাল থেকে মানুষ চেষ্টা করেছে কাজের জিনিসকে সুন্দর করতে—মোহেঞ্জোদারোর ঘটি-বাটিতেও তার প্রমাণ জাজ্বল্যমান—কিন্তু তার সঙ্গে আধুনিক রেল-এঞ্জিনের অনেকখানি তফাৎ। রঙিন ছবি-আঁকা বাসন আর নেহাৎ সাদাসিধে বাসনের মূল্য কার্যকারিতার দিক থেকে একই; ছবিটা সেখানে বাহুল্য, বিলাসিতা, মানুষের সৌন্দর্য-বোধের অবাধ্য ফুল। কিন্তু এঞ্জিনের কারিগর জিনিসটাকে সুন্দর করবার জন্যে কিছু করেন নি, সবই করেছেন উচ্চতম

কার্যকারিতার দিকে লক্ষ্য রেখে; কিন্তু আশ্চর্য এই যে খুব বেশি কাজের জিনিস হ'তে গিয়েই সেটি হ'য়ে পড়েছে সুন্দর। এমন ঘটনা যন্ত্র-যুগের আগে সম্ভব ছিলো না। এ-রকম অনেক যন্ত্রই আজকাল আমরা প্রতিদিনের জীবনে দেখছি ও ব্যবহার করছি। এবং যেখানে বিবিধ যন্ত্র পারস্পরিক নিখুঁত সহযোগিতায় অভ্রান্ত কাজ ক'রে যাচ্ছে, সেখানকার দৃশ্যে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন অভিভূত যার না হয়, সমুদ্র কি তুষারশ্রেণীও তাকে হয়তো নাড়া দেবে না। বিরাট একটি কারখানার মধ্যে ঢুকলে আমার তো মনে হয় মহিমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু সে-মহিমাকে ছন্দে বন্দনা করবে যে-কবি, সে-কবি আমি নই, হয়তো তার জন্মও এখনো হয়নি।

এ-কথা বলছি এই জন্যে যে যন্ত্র যদিও এই পৃথিবীর চেহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্যরকম বদ্‌লে দিয়েছে ও দিচ্ছে, তবু কবিতাকে সে এখনো বিশেষ বদ্‌লাতে পারেনি। তার প্রমাণ এই যে উপরি-উক্ত বিষয়গুলো নিয়ে মহৎ কবিতা এখন পর্যন্ত কেউ লেখেন নি—আমি যতদূর জানি, সোভিএট রাশ্যার নব-জাত সমাজেও নয়। কবিতা এখনো পুরোনো দিনের ধুয়ো ধ'রেই চলছে— চাঁদ-তারা, ফুল-পাখি, জল-মেঘ-আকাশ কোনো দেশের কোনো কবিতা থেকেই খুব বেশি দূরে থাকে না। অনেকে বলেন, এ-জিনিসগুলি কবিতার চিরন্তন উপজীব্য। কবিতা যখন লিখি, তখন আমারও প্রায় ঐরকমই মনে হয়, কিন্তু যুক্তির দিক থেকে কথাটা নিশ্চয়ই ভুল, কারণ বিশ্ব পরিবর্তনশীল। এ-কথাই বরং সত্য মনে হয় যে কবিদের প্রকৃতির প্রতি আসক্তি মানুষের কৃষিনির্ভরতারই ফল। মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনে যে-সব জিনিসের প্রাধান্য বেশি কবিতায় সেগুলোই বেশি ক'রে স্থান পাবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কৃষি-যুগে প্রকৃতি ছিলো আমাদের সর্বস্ব; ঋতুর বিবর্তন, রোদ ও বৃষ্টি, মেঘ ও বিদ্যুত সবই ছিলো গভীর অর্থময়, আদিযুগ থেকে কবির বন্দনা-গান এদেরই লক্ষ্য ক'রে। আজ আমরা প্রকৃতিকে জয় করেছি, আমাদের অন্ন-জল ঋতুর খামখেয়ালের উপর আর নির্ভর করে না, কিন্তু আমাদের কবিতা কৃষিযুগের ঐতিহাসিক স্মৃতি এখনো বহন করছে। কেননা সমাজে পরিবর্তন যত দ্রুত হয়, শিল্পে তা হওয়া অসম্ভব; সামাজিক জীবনে বিপ্লব ঘটে, কিন্তু শিল্পকলা চলে বিবর্তনের মন্থর পথ ধ'রেই।

আধুনিক কবিতা, তাই, যথেষ্টরকম আধুনিক নয়। ঐতিহাসিক হিসেবে তা অনেকখানি পেছিয়ে আছে। যন্ত্রযুগে ব'সে কৃষিযুগের বেসাতি নিয়েই তার কারবার। বলতে হয়, যন্ত্রে এখনো আমরা অভ্যস্ত হইনি। উনিশ শতকের কবিরা তো তারস্বরে প্রতিবাদই করেছেন, এ-যুগে আমরা অগত্যা মেনে নিয়েছি, কিন্তু ভালোবাসতে এখনো শিখিনি। আরো দু'চার শতাব্দী কাটলে হয়তো আমরা সেই আবেগময় মনোভাব নিয়ে যন্ত্রকে দেখতে পারবো, যে-মনোভাব নিয়ে আজ আকাশ কি পাহাড় কি আষাঢ়ের কালো মেঘকে দেখি। কবিতার রক্ত-মাংস এ দিয়ে গঠিত হবে তখনই, তার আগে নয়। আপাতত যেটুকু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা অতি সামান্য। কোনো কবিতায় রেলগাড়ি কি টেলিফোনের উল্লেখ পেলে রাগ করবারও কিছু নেই, উল্লসিত হবারও কিছু নেই। পুরোনো কবিতায় যেমন ঘোড়া, নৌকো কি ধনুকের অজস্র উল্লেখ পাওয়া যায়, এ-যুগের কবিতাতেও তেমনি টর্পেডো কি ট্যাঙ্ক কি এরোপ্লেন এসে ঢুকবেই। ধনুকের সঙ্গে একদিন ভুরুর উপমা হতো, তেমনি আজ যদি ট্যাক্সির মিটরের শব্দের সঙ্গে প্রেমিকের হৃৎস্পন্দনের তুলনা হয় তাহ'লে একে নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা ব'লেই ধরতে হবে। জীবনের নিত্যপরিচিত জিনিসগুলো চিরকালই কাব্যের উপাদান; তাই একদিকে প্রাচীনপন্থীদের গতানুগতিকতা, যার ফলে প্রিয়ার মুখের সঙ্গে চাঁদ ভিন্ন অন্য উপমা অসহ্য লাগে, এ যেমন অবজ্ঞেয়, তেমনি নবীনত্বের দম্ভ, যার বিচারে স্কাইস্ক্রেপার নিয়ে কবিতা লেখাটা একটা বিরাট বাহাদুরি, সেটাও হাস্যকর। আসলে, কবিতায় বিষয়বস্তু উপলক্ষ্য মাত্র; সেটাকে অবলম্বন করে' কবি বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌছন, যার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ অনেক সময় সুদূর। সেই লক্ষ্যে পৌছতে পারলেই কবিতাকে আমরা ভালো বলি; আর লক্ষ্যভ্রষ্ট কি লক্ষ্যহীন হ'লেই কবিতা হয় অন্ত্যজ, তা বিষয় 'চিরন্তন'ই হোক আর 'অতি-আধুনিক'ই হোক্। বিজ্ঞান এখনো আমাদের গা-সহা হয়নি ব'লেই কোনো কবিতায় রিফ্লেক্স কি ডাইন্যামো কি ইলেকট্রনের উল্লেখ পেলে আমাদের চমক লাগে; কারো-কারো মনে এ যেমন বিরক্তির উদ্রেক করে, তেমনি এ-ও দেখা যায় যে, আর-কোনো কারণে নয়, নিতান্তই শেল্ কি সবমেরিন নিয়ে দু'একটা কথা আছে ব'লেই একটি রচনা সদম্ভে কবিতার দরবারে এসে হাজির। বিজ্ঞানে যখন আমরা অভ্যস্ত হ'বো, তখন এ-মনোভাব আর থাকবে না; সমসাময়িক বিষয়গুলিকে আমরা সহজভাবেই গ্রহণ করবো; কাব্যিক গুণ (কি গুণের অভাব) দিয়েই হবে কবিতার বিচার।

গন্ধমূষিক

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

তর্কালঙ্কার মহাশয় শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিই ছিলেন না, উদারও ছিলেন। দেবতাদের মধ্যে কোন শ্রেণী-ভেদ বা জাতিভেদ তিনি মানিতেন না। এমন কি, তিনি এমন পর্য্যন্ত মনে করিতেন যে, তেত্রিশকোটি দেবতা আসলে এক দেবতারই নানা মুখোসমাত্র এবং একথা তিনি গোপন করার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতেন না। দেবতা-বিষয়ে তিনি যে অসাম্প্রদায়িক, তা কাজেও প্রমাণ দিলেন পুত্রের নাম শিবরামকিঙ্কর রাখিয়া। অবশ্য দুষ্ট লোকে সন্দেহ করিত যে, পণ্ডিতমশায়ের মনে মনে একটা গোপন দুরাশা ছিল যে, এক ঢিলে সব পাখী মারিবেন, অর্থাৎ এইভাবে সকল দেবতার প্রসন্নতা পুত্রের জন্য কায়েমী করিয়া রাখিবেন।

কিন্তু সময়ে পণ্ডিতমশায়ের ভুল ভাঙিল। নামকরণের সময় লোভের বশে নামটার অর্থের দিকে তত অবহিত হন নাই। নামটী সিদ্ধবীজমন্ত্রের মতই সার্থক হইল, ফলে বয়স হইতেই দেখা গেল পুত্রের মধ্যে শিবরামের কিঙ্কর ভূত-প্রেত-হনুমানেরা একদেহেই মূর্ত্তিমান হইয়াছে। পণ্ডিত-মশায় নিজের অনবধানতার জন্য হায় হায় করিলেন, অনুতাপ করিলেন। কিন্তু বলা-কথা জিভে ফেরে না, ছোড়া-তীর তূণে আসেনা, আর দেওয়া-নাম ফিরাইয়া নেওয়া যায় না।

কিশোর বয়সেই পুত্রের শরীরের বাড়ন ও গড়ন দেখিয়া পিতা যৎপরোনাস্তি অস্বস্তি ও উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কারমশায় ভেজালশূন্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই ব্রাহ্মণ-বংশে এমন দীর্ঘাকৃতি সবল শরীর অব্রাহ্মণোচিত বলিয়াই মনে করিলেন। আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির বাগর্থের মতই একটা হরগৌরী-সম্বন্ধ তিনি দেখিতে পাইলেন এবং নিজের আবিষ্কারের কথা ব্রাহ্মণীকে জানাইয়া বলিলেন—"ও ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের এমন রাজসিক আকৃতি হয় না।"

পিতাও পুত্রের শত্রুস্থানীয় মাতৃশাস্ত্রে অনুশাসন আছে। তাই পিতার অমঙ্গল দৃষ্টি হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য গৃহিণী যে-ভাবে প্রস্তুত হইলেন যে দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি অনুপস্থিত পুত্রকে নিজের শরীর দিয়া আড়াল করিয়া লইয়া আক্রমণোদ্যত ভীষণ শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছেন।

মুখে বলিলেন—"রোগা দুর্ব্বল বেঁটে না হ'লে সাত্ত্বিক হয়না, না? কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে শুনি?" বলিয়া স্বামীর কল্পিত অমন আদর্শ ব্রাহ্মণের মুখে সম্মার্জ্জনী মারিবার অভিলাষ জানাইলেন। পণ্ডিতমশায় তর্কশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন বটে, কিন্তু সম্মার্জ্জনী-লড়াইয়ে মোটেই পটু ছিলেন না। তা ছাড়া, প্রতিপক্ষ ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত তর্ক করিতেছেন না। তাই ধৈর্য্য ধরিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

গৃহিণী পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনে কার্পণ্য করিলেন না, সদয়কণ্ঠে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিলেন—"দেখে নিও, কালে ও কত বড় নামজাদা ব্রাহ্মণ হয়। তোমাকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে রাখলাম।" বলিয়া একই বৃন্তে স্বামীভক্তি ও পুত্রস্নেহ সুকৌশলে ফুলের মত ফুটাইয়া তুলিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

কালে পুত্র কতবড় ব্রাহ্মণ হয়, সে-দৈর্ঘ্য দেখিবার অবসর কালই তাদের দিলনা, আয়ু ফুরাইয়া যাওয়ায় তাঁদের মরিতে হইল। এই বৃহৎ পৃথিবীতে আপন বলিতে শিবরামের জন্য এক বিধবা পিসী রহিয়া গেলেন।

বিদ্যা অর্জ্জনে ও সঞ্চয়ে শিবরামের ব্রাহ্মণোচিত অনাসক্তি ছিল। অথচ প্রবীণেরা তাকে গন্ধমূষিক বলিয়া ডাকিত—স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে একটা তুলনামূলক ইঙ্গিত এই নামে সূচিত হইত। মেয়েরা সরল, বুদ্ধির ধার ধারিত না, সোজাই বলিত—"তুই বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ছুঁচা হয়েছিস।"

শুনিয়া শিবরাম দুঃখ পাইতেন না, লজ্জিত হইবার আবশ্যকতা বোধ করিতেন না, বরং হাসিতেন যেন খুব একটা মজার কথাই মেয়েরা তাহাকে শুনাইয়াছে।

শিবরামকিঙ্কর নাম লোপ পাইল, গন্ধমূষিকও বেশী দিন টিকিলনা এবং ছুঁচার পরমায়ুও অস্থায়ী দেখা গেল। নামের ল্যাজামুড়া বাদ গিয়া মধ্যাংশ লোকের ব্যবহারে আসিল, শিবরামকিঙ্কর রামঠাকুর বলিয়াই পরিচিত হইলেন।

পিতা ক্ষত্রিয় সন্দেহ করিয়া অব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, দশজনে কার্য্যকলাপ দেখিয়া আরও দুইধাপ নীচে নামাইয়া আনিল ও মন্তব্য করিল,—"ব্রাহ্মণের মধ্যে গলায় পৈতাগাছ শুধু, নইলে ওটা তো শূদ্রেরও অধম।"

রামঠাকুরের স্বপক্ষে শত্রুরাও একটি কথা স্বীকার পাইত যে, তাঁর হাতের লেখা অতি চমৎকার, সামনে বসিয়াই অপরের সহি এমন নকল করিয়া দিবেন যে, লেখক নিজেই চোখে দেখিয়াও জাল সহিকেই আসল লেখা বলিয়া গ্রহণ করিতে লুব্ধ হইবে।

রামঠাকুর ঘরের খোলা বারান্দায় তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিলেন, নীচে মাটীতে বসিয়া হরেকেষ্ট নাপিত তাঁর উপদেশাবলী গো-গ্রাসে গিলিতেছিল। যে অমৃত-সমান কথা হইতেছিল, তা হরেকেষ্টর মত পুণ্যবানেরাই শুধু শুনিবার অধিকারী। এক সময়ে হরেকেষ্ট জানিতে চাহিল—"ঠাকুর, তোমার বয়স এখন কত? দু'কুড়ি হবে—কি বল?"

"তা তো হবেই।" বলিয়া হরেকেষ্টর নির্ভুল অনুমানে মাথা নাড়িয়া রামঠাকুর সায় দিলেন।

"দেখে কিন্তু মনে হয়না। বাপ-মার পুণ্যের জোর ছিল, সত্যিকালের শরীর পেয়েছ।"

রামঠাকুর নিস্পৃহ-কণ্ঠে অতি আলগোছে জিভ হইতে উত্তরটাকে বাতাসে ছাড়িয়া দিলেন—"শরীর রাখতে জানা চাই।"

হরেকেষ্ট তাহাই চাহিতেছিল, সে গোপন কৌশলটা জানিবার আগ্রহে লোলুপ ক্ষুধা তার চোখে সারমেয়র মত জিভ বাহির করিল। সোজা প্রশ্ন সে করিল না, শুধু মন্তব্য করিল—"ইচ্ছে করলেই কি আর শরীর রাখা যায়—"

"খুব যায়। চিন্তে-ভাবনা ছেড়ে দিলেই দেখবে শরীর শালগাছের মত হয়ে উঠেছে।"

হরেকেষ্ট বড়ই হতাশ হইল, ভাবিয়াছিল যে, একটা গোপন প্রক্রিয়া আছে, তা আদায় করিয়া লইতে পারিলে আজীবন যৌবন আটকাইয়া রাখিতে পারিবে। মন হইতে চিন্তা-ভাবনা খেদানো, একি একটা সম্ভবপর কথা হইল! আর মনে যদি চিন্তা-ভাবনা নাই রহিল, তবে যে জল-শূন্য শুকনো পুকুরের অবস্থা দাঁড়াইবে।

হরেকেষ্ট কথাটা বিশ্বাস করিতে বেগ পাইতেছে বুঝিয়া রামঠাকুর তাহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। বলিলেন—"এত নেশা করলে, তা দেখছি কোন কাজেই এল না, ভস্মেই ঘি ঢেলেছ। নেশার আসল ফলটাই পেলেনা।"

নেশা করিয়াও নেশার ফল হইতে বঞ্চিত রহিয়া গিয়াছে, নিজের এত বড় দুর্ভাগ্যের সংবাদে হরেকেষ্ট আরও কাহিল হইয়া পড়িল।

রামঠাকুর কহিলেন—"শিব কি খামোকা মহাদেব হয়েছেন ভাব? অমৃতের ধার দিয়েও কেন গেলেন না? ভাং, গাঁজা, বিষ এসব নিয়ে রইলেন কেন শুনি? দেবতারা দেবতাই রয়ে গেছে, আর উনি হলেন মহাদেবতা—নেশার কৌশল কেউ তাঁর কাছে আদায় করে' নিতে পারেনি, বুঝলে?" রামঠাকুরের চোখেমুখে এমনই ভাব যেন তিনি একটা গুহ্যবিদ্যার কথা আজ হরেকেষ্টকে উপদেশ করিলেন যা বেদের ঋষিরাও জানিতেন না। ভয়ে ও শ্রদ্ধায় হরেকেষ্ট প্রায় আধমরা হইয়া আসিল।

হতভাগ্য হরেকেষ্টর জন্য রামঠাকুর বড় অনুকম্পা বোধ করিলেন। এর পরে, কোন্ নেশার কি ফল কি উপায়ে লাভ করা যায়, সজাগ থাকিলে কেমন করিয়া চিন্তা-ভাবনাগুলিকে বদ্ধ করিয়া শুধু বুদ্ধিকে খোলা রাখা যাইতে পারে এবং অবশেষে সহস্রার কোন্ ছিদ্রপথ দিয়া একজাতীয় রস চুয়াইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া শরীরে ও মনে অমৃতের চেয়েও বেশী কাজ করে, তা রামঠাকুর বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এবং ভক্ত হরেকেষ্ট কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত কেবল তাহা গিলিয়া যাইতে লাগিল।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া একটী লোক বারান্দায় উঠিয়া আসিল, গুহ্য তত্ত্বালোচনায় বাধা পড়িল।

"কি গোবর্দ্ধন, খবর কি? বস।"

গোবর্দ্ধন খবর দিতেই আসিয়াছিল, কিন্তু বসিলনা, দাঁড়াইয়াই বলিল—"আপনি না গেলে তো চলছে না, চলুন।"

"চলুন তো বুঝলাম, কি চলছে না তাই বল।"

"রাজেনবাবুর ছেলেটী মারা গেছে সেই ভোর রাত্রে, মড়া পড়ে' আছে, তাঁর স্ত্রী তা জড়িয়ে পড়ে' আছেন, নেওয়া যাচ্ছে না।"

"যাও, বলগে যে, ওটাকে ছেড়ে দিন। পরে যেটা আসবে সেটার জন্য যেন শোক করেন। বেঁচে থাকলে বছরারই মা হোতে পারবেন, ছেলের জন্য শোক করবার সুযোগ অনেক পাবেন—কি বল হরেকেষ্ট?"

হরেকেষ্টর সমর্থন প্রার্থনা করা হইল, কিন্তু হরেকেষ্ট তা দিতে পারিল না। সদ্য-শোকাতুরা মা ছেলের শরীর জড়াইয়া পড়িয়া আছে, ছবিটী তাকে একটু উন্মনা করিয়া দিয়াছিল।

রামঠাকুর গোবর্দ্ধনকে উৎসাহ দিলেন—"যাও, ব্যাটা ছেলের মত কাজ কর গিয়ে। লোকে বাঘিনীর কোলের বাচ্চা ছিনিয়ে আনে, আর এটা—" এইটুকু পর্য্যন্ত শুনিয়াও গোবর্দ্ধনের তেমন উৎসাহ হইতেছে না দেখিয়া রামঠাকুর বক্তব্য শেষ করিলেন—"বেশ, যাও, আমিই আসছি।"

"তাড়াতাড়ি করেন যেন" বলিয়া গোবর্দ্ধন বিদায় লইল।

হরেকেষ্ট নালিশ করিল—"ঠাকুর, দয়ামায়া বলে' কোন পদার্থ তোমার নেই নাকি?"

হরেকেষ্টর অহেতুক নালিশের প্রতিবাদের আবশ্যকতা রামঠাকুর বোধ করিলেন, বলিলেন, "থাকবেনা কেন? খুব আছে। দুঃখকষ্ট দেখলে আমার যা কষ্ট হয়, তা তোমরা বুঝবে না। নেশা না করলে কবেই ভেঙে পড়তুম; ঐতেই তো দাঁড় করিয়ে রেখেছে।"

বিপদে-আপদে দুঃখে-কষ্টে মানুষের শিরদাঁড়া খাড়া রাখিতে নেশার শক্তি কত অমোঘ, এ সম্বন্ধে হরেকেষ্টর অজ্ঞানতা দূর করিতে রামঠাকুর উদ্যোগী হইতেছিলেন, কিন্তু বাধা পড়িল, সম্মুখের উঠান হইতে আহ্বান আসিল—"ভট্‌চায্যি বাড়ী আছ?"

এবং পরক্ষণেই আহ্বানের পিছনে পিছনে দত্তমহাশয় সশরীরে সম্মুখে আসিয়া দেখা দিলেন।

হরেকেষ্ট সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া ঝুঁকিয়া নমস্কার করিল। রামঠাকুর তক্তপোষ হইতে নামিতে নামিতে অভ্যর্থনা করিলেন—"আসুন।"

বারান্দায় উঠিয়া আসিয়া হরেকেষ্টকে অপাঙ্গে দেখিয়া লইয়া দত্তমশায় আসন গ্রহণ করিলেন।

হরেকেষ্ট দাঁড়াইয়াই ছিল, বসিল না, বলিল—"ঠাকুরমশায়, এখন তবে আসি, ওদিকে একটু কাজ আছে।" বলিয়া প্রণাম সারিয়া সরিয়া পড়িল। যাইবার কালে শকুনী-স্বভাব রুগ্নকায় দত্তমশায়ের দৃষ্টির সঙ্গে হরেকেষ্টর দৃষ্টির পলকের জন্য ছোঁয়া-ছুঁয়ি হইয়া গেল। একমাত্র বুদ্ধিকেই সম্বল করিয়া দত্তমশায় বিরূপভাগ্যের সঙ্গে দীন অবস্থায় লড়াই সুরু করিয়াছিলেন, ভাগ্যকে তিনি জয় করিয়া লইয়াছেন, গ্রামের তিনি ধনী মহাজন। হরেকেষ্টই শুধু নয় অনেক সচ্ছল গৃহস্থই জমিজমা বন্ধক দিয়া দত্তমশায়ের হাতে বড়শী-গাঁথা মাছের মত শক্ত সুতায় ঝুলিতেছে।

"খবর সব ভালো ত দত্তমশায়?"

"হুঁ। কাল মকর্দ্দমার তারিখ, ভোলনি ত?"

"ভুলতে আপনারা আর দিলেন কই। আমার একটু উঠতে হ'ল, রাজেনের ছেলেটাকে শ্মশানে দিয়ে আসছি। বউটা নাকি আবদার ধরেছে কিছুতেই মড়া ছাড়বে না।"

"যেতে হবেনা, নিয়ে গেছে।"

"নিয়ে গেছে? যমদূতটী কে?"

"রাজেনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলাতে সে গিয়ে বৌয়ের হাত ধরে' বলল, কেন মিছে অবুঝ হচ্ছ, ছেড়ে দাও, নিয়ে যাক। শুনে বউটী একবার চোখ মেলে রাজেনের দিকে তাকালো, তারপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এতক্ষণে শ্মশানে পৌঁছে গেছে।"

রামঠাকুর সোৎসাহে বলিলেন—"নেশা করি বলে' এতকাল আপনারা আমাকে যা-ইচ্ছে-তাই বলেন, এখন দেখলেন তো?"

দত্তমশায়ের ভ্রূ সব সময়েই কুঞ্চিত থাকে, ঢিল দিলে পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় এই ভয়ে। সে কুঞ্চিত ভ্রূ আরও কুঁচকাইয়া লইলেন, কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়ের সঙ্গে অমোঘশক্তি নেশার যোগাযোগটা কিছুতেই তিনি ধরিতে পারিলেন না।

"শোক জিনিষটা আসলে একটা নেশা দেখলেন তো? স্বামীর মুখ থেকে এক ডোজ নিয়েই বউটা অজ্ঞান হয়ে গেল। যদি ধাক্কাটা সামলাতে শিখত, তবে তো ও মুক্ত হয়ে গেছল।

নেশাকে ঠিক মত ধরা চাই, তবে ও ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে, দুঃখ-কষ্ট বলুন কিছুই থাকবেনা তখন। আচ্ছা, দত্তমশায়, আপনি নেশা করেন না কেন?"

দত্তমশায় অনাবশ্যক কথা কানে শুনিতে পান না, বলিলেন—"ভোরেই নৌকো ছাড়তে হবে, কাল একটু সকালে উঠো, বুঝলে?"

"কাল যে আমি যেতে পারি, মনে হয় না। শরীরটা বড়ই খারাপ যাচ্ছে।"

"নেও ঠাকুর, বেশী প্যাঁচ কোষনা। কম তো নাওনি, এর মধ্যেই ছতানাতায় পঞ্চাশ টাকার বেশী নিয়েছ। হাঁ, স্বীকার পাই, তোমার কাছে একটু ঠেকা আছি। কিন্তু সবটারই একটা সীমা থাকা চাই। নাও, এই পাঁচটা টাকা রাখ। দোহাই তোমার, ডুবিও না যেন।"

"আবার পাঁচটা কেন, দশটাই দিন। এতবড় সম্পত্তি হাত করবেন, ধর্ম্মত আমাকে আপনার আদ্ধেক দেয়া উচিত, একশটা টাকাও যদি দিতেন। ভেবে দেখুন দিকি, কতবড় অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছি। আপনার জন্য জাল করেছি, বিধবা ও অনাথ শিশুকে ঠকিয়ে সম্পত্তি পাইয়ে দিচ্ছি, এমন কি মিথ্যে সাক্ষী হতে পর্য্যন্ত চলেছি। জাতও গেল, পেটও ভরল না। নরক-বাস তো ঠিক হয়েই আছে, সেজন্য আর ভাবিনে—আর ক'টা টাকা দিতে আপনাদের এরকম ভাব।"

ভাবী নরকের সম্ভাবনা, বর্ত্তমানের দুষ্কার্য্য ও এই অবস্থায় দত্তমশায়ের হৃদয়হীনতা বাবদ রামঠাকুর তাঁর মুখখানা যথাসাধ্য বিষাদগ্রস্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইলেন।

দত্তমশায় কহিলেন—"মিথ্যে কোথায়? দুটো উইলই তোমার লেখা, জাল হ'ল কেমন করে'?"

"তা ঠিক, নিজের সই জাল করিনি। কিন্তু আর সইগুলো?"

দত্তমশায় অবাঞ্ছিত প্রশ্নও কানে শোনেন না, উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"তোমার পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন সহজে ছাড়বার লোক তুমি নও, জানি। অদৃষ্টে অর্থ দণ্ড আছে। নাও—" বলিয়া ট্যাঁক হইতে আরও পাঁচটি টাকা রামঠাকুরের হাতে দিলেন। বলিলেন—"ভোরেই যেতে হবে, আবার বেঁকে বোসোনা যেন।"

"কি যে বলেন! টাকা নিয়েছি, বেঁকে বসলেই হ'ল? সত্যি দত্তমশায়, আপনাকে দেখে ভক্তি হয়।"

উঠানে নামিতে নামিতে দত্তমশায় থামিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

—"আপনিই খাঁটি মানুষ। যা চান, তার জন্য আপনি সব করতে পারেন। জাল করতে, ঘরে আগুন দিতে, খুন করাতে আপনার সঙ্কোচ আসেনা, দ্বিধা হয় না। এ যে কত বড় শক্তিমানের লক্ষণ, বিশ্বেস করবেন না, একা শুয়ে শুয়ে কতবার ভেবেছি। আপনার কাছে আমরা সব শিশুমানুষ।"

দত্তমশায় উঠানে নামিয়া পড়িলেন, প্রশংসায় তাঁর রুচি নাই দেখা গেল। উঠান হইতে ডাকিয়া বলিলেন—"কাল ভোরে আমি আসব।"

"খামোকা কষ্ট করে' কেন আসবেন। যদি বিশ্বেস না হয়, বেশ, কাউকে নয় পাঠিয়ে দেবেনা"

অপরাহ্ণ। সেই বারান্দাতেই রামঠাকুর তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিলেন। ওদিকের

বাগানের মাথার কাছাকাছি সূর্য্য নামিয়া আসিয়াছে। খুব ভালো করিয়াই রামঠাকুর নেশা করিয়া লইয়াছিলেন, আরও করিবেন মনে মনে ইচ্ছা রাখিয়াছেন।

সাদা চাদরে গা ঢাকিয়া অল্পবয়সী এক বিধবা বারান্দায় দ্রুতপদে উঠিয়া আসিল, দ্রুত শ্বাস-পতনের শব্দে বুঝা গেল যে, উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছে।

"কে, চিহ্নর মা? হাঁপিয়ে গেছ যে, বোসো।"

"হুঁ, বসছি।" বলিয়া মাটীতেই উপবেশন করিল।

"হাঁ বোসো। জিরিয়ে নেও, তারপর ধীরেসুস্থে যতখুসী বলে' যাও।"

বিধবা জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর তুমি কি ব্রাহ্মণ?"

"কেন, বিশ্বেস হয় না?"

"না, বিশ্বেস হয় না। ব্রাহ্মণে এ কাজ পারে না।"

"খুব পারে, তুমি বামুনের খবর রাখনা। পারে যে তার প্রমাণ তো তোমার সামনেই রয়েছে।"

"না, তুমি বামুন নও, তুমি চামার।"

"তুমি বল্লেই তো আর হবে না। গলায় পৈতে রয়েছে, সবাই জানে আমি দেশবিখ্যাত তর্কালঙ্কারের ছেলে। আর তুমি এসে ফস্ করে' চামার বলেই জাত বদলে দেবে? তা কি আর হয়?"

বিধবা রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"দোহাই ঠাকুর এতবড় সর্ব্বনাশ তুমি কোরোনা। এত পাপ ভগবান সইবেন না।"

"হুঁ খুব সইবেন। ভগবান সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাই এমন কথা বলছ। ভগবান কি তোমার আমার মত, তাঁর ধৈর্য্য অসীম।"

"একটা অনাথ শিশু ও বিধবার সর্ব্বনাশ করতে তোমার মনে একটুও লাগে না?"

"লাগে না আবার! কত ভাবি, এদের সর্ব্বনাশ তো ঠেকানো যাবে না, উচিতও নয়, তাই বলি যে, ভগবান এগুলিকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেও। এরাও জুড়োক, পৃথিবীর দুঃখও কমুক।

বিধবা ধীর কণ্ঠেই কহিল—"তুমি যে কতবড় পাষণ্ড অমানুষ, তা তুমি জান না। দত্তমশায়কে আমি বুঝি, কিন্তু তোমার দিকে চাইতেও আমার ঘৃণা হয়।"

"পৃথিবীর নিয়মই যে এরকম। কাউকে দেখেই ভালোবাসবে, আবার কাউকে দেখেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে,—এড়াবার কোন পথই নেই।—কি জন্য এসেছ, খুলে বল।"

বিধবা যেন আশ্বস্ত হইয়া উঠিল, বলিল—"কাল তুমি সদরে যেতে পারবে না।"

"খুব পারব। কথা দিয়েছি, সত্যিই তো আর চামার নই, ব্রাহ্মণ যখন হয়েছি কথা আমার রাখতেই হবে। তাছাড়া টাকাও যে নিয়েছি, এখন না গিয়ে উপায় কি।"

"বেশ দেও। কিন্তু আমাকে কথা দাও যে সত্য কথাই বলবে।"

রামঠাকুর জানিতে চাহিলেন—"সত্য বলে' আমার লাভ? কিসের লোভে আমি সত্য বলব, আমাকে বুঝিয়ে বল।"

"বেশ, তোমার ধর্ম্ম যা বলে তাই কর"—বলিয়া বিধবা উঠিতে যাইতেছিল।

রামঠাকুর বাধা দিলেন বলিলেন—"বেশ তোমার কথা রাখতে পারি যদি—"

"যদি কি ?"

যদি শুনিয়া বিধবার দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

"রেগে যে আগুন হয়ে গেলে? কি এমন বলেছি শুনি? এ কাজ যেন ভূভারতে তুমিই আজ প্রথম করতে যাচ্ছ, পৃথিবীতে কেউ আর করেনি, করছে না—না? কি যে পাপ-পুণ্যের বিষ মগজে ঢুকেছে, যেন ভাতের হাঁড়ি, ছোঁয়া লাগলেই ফেলা যাবে। সাধে কি বলে মেয়ে বুদ্ধি, কখন কিসে যে কাজ আদায় হয় জানবে না, করবে না।"

পরদিন রামঠাকুর আদালতে এমন কাণ্ড করিয়া বসিল যে, আদালত প্রাঙ্গনেই দত্তমশায় অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শেষে তুমি আমাকে এ ভাবে ডোবালে? তুমি কত বড় পাষণ্ড আমি দেখে নেব।"

রামঠাকুরও চটিয়া কহিলেন—"হুঁ, আপনার জন্য এখন আমি জেল খাটলে পারি? চেয়ে তো আর দেখেন নি, হাকিম আপনার উপর কি রকম চটে ছিলেন, কি রকম করে' কেবল তাকাচ্ছিলেন। আপনার মকর্দ্দমা তো ডিসমিস হয়েই ছিল, মাঝ থেকে আপনার জন্য আমি জেল খেটে মরি আর কি—"

"হুঁ" বলিয়া দত্তমশায় চুপ করিয়া গেলেন এবং একটা দৃঢ় সঙ্কল্প ভিতরে চাপিয়া লইলেন।

রামঠাকুর সন্ধ্যার দিকে একাই গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

বিধবা আসিয়া পায়ের উপর উপুড় হইয়া প্রণাম করিল।

রামঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে, চিনুর মা?"

"আমাকে ক্ষমা করেছ বলো। মাথাঠিক রাখতে পারিনি, যা'তা বলে' গেছি, বল ক্ষমা করেছ। তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি দেবতা।"

রামঠাকুরের মন ভালো ছিল না, বলিলেন—"থাক্ থাক্, অত ভক্তির দরকার নেই, সবাইকেই আমি চিনি।"

তারপর হঠাৎ তাঁর মনে পড়িয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার প্রস্তাবের কি হ'ল শুনি?"

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ লোকটির চোখের দিকে চাহিয়া বিধবা কহিল—"হ্যাঁ, আমি রাজী, তুমি এস।"

"দোর খোলা রেখ, একটু রাত হবে কিন্তু।"

"আমি সারারাত তোমার জন্য জেগে থাকব। সত্যি, যেতে পারবে তো?"

রামঠাকুর হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন—"যেতে পারব না, কি যে বল। এর জন্য মরা মানুষ কবর থেকে উঠে আসতে পারে,—মেয়ে মানুষ কিনা, মানুষ কিসের জন্য কি করতে পারে তার খোঁজ-খবর কিছু রাখ না। দোর খোলা রেখ কিন্তু।"

একজন সত্যই তার কথা রাখিল, সারারাত্র জাগিয়া প্রতীক্ষা করিল। অন্যজন নেশায় বুঁদ হইয়া খোলা বারান্দায় তক্তপোষের উপর মড়ার মত সারারাত্র পড়িয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ হইয়াও কথা রাখিতে পারিলেন না।

সাধে কি প্রবীণেরা বলিতেন, সে একটা গন্ধমূষিক অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার তনয় ছুছুন্দর।

আধুনিক যন্ত্র ও নক্ষত্রলোক

নিশাপতি ভট্টাচার্য্য

নক্ষত্রলোকের চর্চ্চা অতি প্রাচীন কাল থেকে হয়ে এসেছে। স্থান কালের ক্ষুদ্রত্ব নিয়ে চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কালের ও স্থানের অসীমত্ব সম্পর্কেও নানা অনুমান ও প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে নানা সভ্যতায়। ইদানীং এমনি করে' দর্শনের অনুভূতিগুলিকে বিজ্ঞান প্রাণদান করেছে।

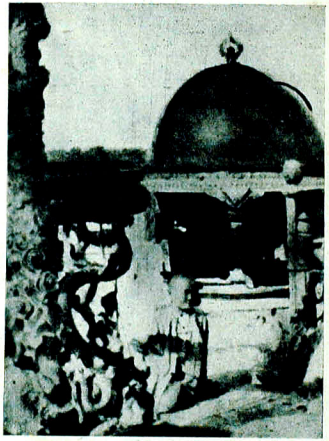

প্রাচীনতম চৈনিক মানমন্দির (ত্রয়োদশ শতাব্দীর)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবেষ্টন ও আবহাওয়া আকাশলোক সম্বন্ধে এক জ্ঞানবিপ্লব উপস্থিত করেছে। একদিকে এক সেকেণ্ডের লক্ষ অংশ নিয়ে মাপ পরিমাপ সম্ভব হয়েছে, অপর দিকে এক ইঞ্চির লক্ষভাগও কল্পিত ও নির্ণীত হয়েছে। অণুকে বিভক্ত করা হয়েছে, তবুও বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত হয়নি। উপনিষদের "অণো অণীয়ান মহতো মহীয়ান" দৃষ্টি নক্ষত্রলোক চর্চ্চায় যতটা উদ্বুদ্ধ হয় এমন আর কোথাও নয়। আধুনিক যন্ত্র নব্বই লক্ষ কোটি মাইল দূরস্থ নীহারিকা প্রত্যক্ষ করেছে। এ স্বপ্ন নয়, বাস্তব ব্যাপার!

প্রাথমিক গ্রীকরা দূরত্ব সম্বন্ধে চর্চ্চা করতে ভীত হ'ত। তাদের ঝোঁক ছিল "a sense of the near"এর উপর। এ জন্যই মনীষী Spengler বলেন গ্রীক কখনও সুদূরে ভূমধ্যসাগরের দিকে যায়নি। নক্ষত্রলোক সম্বন্ধে চর্চ্চা করাও তাদের আকর্ষণের বিষয় ছিল না। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যার প্রচুর চর্চ্চা হয়। কিন্তু চোখের বাইরের রাজ্য সম্বন্ধে বহুমুখী আবিষ্কার সম্ভব হয় যন্ত্রাদি সৃষ্টির পর।

এ সম্বন্ধে চীনের মানমন্দির অতি প্রাচীন সৃষ্টি। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক Marco Polo চীন দেশে এসব যন্ত্রাদি দেখে মুগ্ধ হন। এসবের রচনা কাল হচ্ছে ত্রয়োদশ শতাব্দী (১২৭৯খ্রীঃ)। সম্রাট কাবলা খাঁ একটি মানমন্দির রচনা করেন এবং তা'তে ৬ ফিট ব্যাসের একটা Zodiacal গোলক ছিল। এই মানমন্দিরে ক্রমচিহ্নিত (graduated) প্রকাণ্ড চক্রসমূহের সাহায্যে গ্রহাদির উত্থান (ascension) ও অবনয়নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হ'ত। এই মানমন্দিরের জন্য ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ছ'টি নূতন যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। একটি যন্ত্র হতে জল প্রবাহিত করা হ'ত এবং এই প্রবাহের সাহায্যে সময়কে বিভাগ করা হ'ত। পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষে জয়পুরাদি অঞ্চলে Sundial ও যন্তর-মন্তর প্রভৃতি সৃষ্টি হয় সময় নিরূপণের জন্য।

চীনদেশে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিনশত শতকে equinoxes ও solstices নির্ণীত হয়েছে। Shiking (Book of Odes) নামক গ্রন্থে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৭৫ সালের ২৯এ অগাষ্টের সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ আছে ইতিহাসে সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে এর অপেক্ষা প্রাচীন লিপি পাওয়া যায় না। Ma Twan Lingএর বিশ্বকোষে ৬০০ সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ পাওয়া যায়। এদের কাল হচ্ছে খ্রীঃ পূঃ ২১৬৮ হতে ১২২৩ (খ্রীঃ পরবর্ত্তী) সাল পর্য্যন্ত।

ভারতবর্ষের বেদের উল্লিখিত বিবরণ ও প্রমাণ হ'তে বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতির্বিদ্যাগত আলোচনায় আর্য্যদের Artic Homoএ আদিম নিবাস সাব্যস্ত করেছেন।* ভারতের গ্রহ নক্ষত্রাদি বিষয়ক চর্চ্চার বিষয় অনেকেরই জানা আছে। বিনয় পিটকে আছে (S. B. E. xxp. 294) ভিক্ষুরা অরণ্যবাস করবে নক্ষত্রের গতি প্রভৃতি আলোচনার জন্য।

প্রাচীন ইউরোপের Copernicus (১৪৭৩—১৫৪৩ খ্রীঃ) Bruno (১৫৪০—১৬০০ খ্রীঃ) ও Galileo (১৫৬৬—১৬৪২ খ্রীঃ) প্রভৃতির রোমাঞ্চকর বিবরণ সকলের জানা আছে।

কিন্তু যতদিন আধুনিক যুগের যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয়নি ততদিন আকাশলোকের অসীম রহস্য জগতের নেপথ্যেই ছিল বলতে হবে।

আধুনিক যন্ত্রপাতির তুলনায় প্রাচীন দূরবীক্ষণ প্রভৃতি খেলনাই বলতে হবে। অসংখ্য দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, Spectroscope বা রশ্মিবীক্ষণ ইদানীং তৈরী হয়ে সমগ্র জগতে আকাশচর্চ্চা সহজ করেছে। নক্ষত্রলোকের অনেক বার্ত্তা এখনও ত অজানা আছে এবং নূতনতর ও বৃহত্তর যন্ত্রের অপেক্ষা করছে।

সম্প্রতি পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ হচ্ছে Wilson Observatoryর।' এ মানমন্দির আমেরিকায় রচিত হয়েছে। এখানকার দূরবীক্ষণের প্রতিফলক কাচটির ব্যাস (diameter)

* তিনি তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।৪।৮) প্রভৃতি হ'তে উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

হচ্ছে ১০০ ইঞ্চি। এই শ্রেণীর একখানি নিষ্কলঙ্ক ফলক তৈরী করা বহু ব্যয়সাধ্য। এই মানমন্দির একজন বিখ্যাত ভারতীয় ব্যবহার করেছেন। তিনি হচ্ছেন Sir C. V. Raman. তাঁর আমেরিকা প্রবাসকালে মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁকে এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্রলোকের আলোক বিকীরণ বিচার করবার সুযোগ দেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে নানা নূতন গবেষণা সম্ভব হয়েছে এবং নক্ষত্র

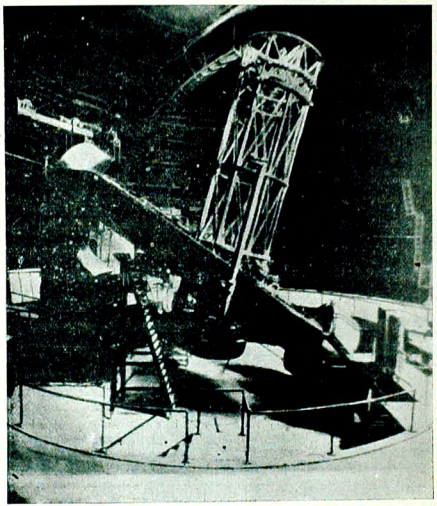

আমেরিকার মাউণ্ট উইলসন মানমন্দির। এই মন্দিরটি একশ' ইঞ্চি প্রতিফলক কাচযুক্ত।

ও নীহারিকা জগৎ সম্বন্ধে বহু প্রাচীন পরিকল্পনা দূরীভূত হয়েছে। এই বৃহৎ দূরবীক্ষণ চল্লিশটি motor-এর সাহায্যে চালিত হয়। সম্প্রতি সমগ্র নক্ষত্রলোক নূতন সামাজিক প্রক্রমানে মানুষের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। বিগত জুলাই মাসে সমগ্র বিশ্বে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় শুক্রগ্রহ হ'তে কোন পুরুষ পৃথিবীতে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা চিন্তা করে'। এ সময় শুক্রের (mars) দূরত্ব পৃথিবী হ'তে ৩৬,০০০,০০০ মাইল মাত্র ছিল। যে হিসেবে আলোর গতিবেগ সঞ্চারিত হয়

সে হিসেবে শুক্রগ্রহ হ'তে কোন radio বার্ত্তা পৃথিবীতে ছুটে আসতে মাত্র সাড়ে তিন মিনিট সময় দরকার হয়। এ সময় পৃথিবী হ'তে অনেক radio messago শুক্রগ্রহে প্রেরিত হয় কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সকলে মনে করে দশ মিটার wave-length হ'লে নক্ষত্রলোকের সঙ্গে সংস্পর্শ সম্ভব হতে পারে। এখনও এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলছে। বলা বাহুল্য ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের পোষ্ট অফিস শুক্রগ্রহে প্রেরণের জন্যে একটি radio telegram গ্রহণ করে—সেজন্য এক শিলিং ছয় পেন্স মাশুল দিতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষেরা কিন্তু এই telegram গ্রহণের সময় "Delivery not guaranteed" কথাটি চিহ্নিত করে' দেন।

সে যাক ইদানীং Wilson Observatory অপেক্ষাও বৃহত্তর যন্ত্র নির্ম্মিত হচ্ছে। নূতন যন্ত্রটি (Hale Observatory) স্থাপিত করা হবে California Palamar পাহাড়ে। এই দূরবীক্ষণের প্রতিফলক কাচখানি হবে ২০০ ইঞ্চি পরিমাণ। সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ এই যন্ত্রটি প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা করছেন। যে সমস্ত নূতন জ্ঞান সঞ্চয় ইদানীং সম্ভব হয়েছে সব-কিছুকেই এই যন্ত্র হতশ্রী করে' দেবে সন্দেহ নেই।

ইদানীং দূরবীক্ষণাদির সাহায্যে আকাশের নক্ষত্রলোক আমাদের নিকট এক চরম বিস্ময়ের বস্তুরূপে প্রতিভাত হচ্ছে। পরিমাপের প্রণালী এজন্য বর্জ্জন করতে হয়েছে। কোটি কোটি মাইলের বিচার বিবেচনা সহজ নয়, অসীম সময়ের ভিতর কালগত ছন্দের উত্থান-পতন নির্দ্দেশের নূতন কাঁজেই উপায় ঠিক করা প্রয়োজন হয়েছে। এক একটি অণুই সম্প্রতি সৌরলোক বলে' বিবেচিত হচ্ছে; কাজেই ইঞ্চির measure যেমন একদিকে বৃহৎ ব্যাপার বলে' কল্পিত হচ্ছে অন্যদিকে কোটি মাইলের দূরত্বকেও সংক্ষিপ্তভাবে ধারণা করে' প্রয়োজনীয় আলোচনার সূত্রপাত অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

নক্ষত্রলোক বল্‌তেই একটা বিরাট অসীমের সঙ্গে তুলনীয় ব্যাপার মনে হয়। অথচ এর ভিতরও দূর ও নিকট ব্যাপার আছে। তা ঠিক করবার উপায় স্থির করাই এক্ষেত্রে প্রাথমিক ব্যাপার হয়েছে।

সৌরজগতের ব্যাস হচ্ছে প্রায় ছয় শ' কোটি মাইল। এর উত্তাপ সূর্য্য হতে আসে। আবার যন্ত্রের সাহায্যে স্থিরীকৃত হয়েছে যে প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকা আকাশে আছে। এর প্রত্যেকটি সহস্র কোটি সূর্য্য উৎপন্ন করতে পারে। কাজেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কত ব্যাপক, কত বিস্তৃত ও কত অগণিত সৃষ্টিলীলার উপকরণ সমাহিত তা' বলা দুরূহ। এ সত্যটি ভাবতে হবে যে এক একটি সূর্য্য আয়তনে পৃথিবীর দশলক্ষ গুণ বড়। দূরত্বের দিক হতে পৃথিবী হতে সূর্য্য ৯৩ কোটি মাইল দূরে এবং চন্দ্র ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে। এসব অতিদূরত্বের বিষয় ধারণা ও চিন্তা দুরূহ। কাজেই একটা সহজ মাপকাঠি প্রয়োজন। সেটা খুব দীর্ঘ না হ'লে চলবে না। এ অভাবের কতকটা ক্ষতিপূরণ হয়েছে আন্তর্নাক্ষত্রিক আলোকের চলবার সময়টিকে এর মানদণ্ড করে'। তাতে বেশ কাজ সিদ্ধ হয়েছে। আলো আমরা চট্ করে' পাই। সূর্য্যের আলো আমরা সাড়ে আট মিনিটে পাই—চাঁদের আলো পৌঁছে এক সেকেণ্ডে। এর কারণ হ'ল আলোর গতিবেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, কাজেই ৯৩ কোটি মাইলও এই গতির নিকট তুচ্ছ হয়ে পড়ে

এবং আমরা দিব্য আরামে সাড়ে আট মিনিটে উষ্ণ উত্তাপ ও আলো পেয়ে থাকি সূর্য্যদেবের অগ্নিকুণ্ডের কটাহ হ'তে।

এজন্য সময় পরিমাপের ভঙ্গী দাঁড়িয়েছে অন্যরকম।

একদিকে একশ সেকেণ্ড বা মিনিটের ভিতর আলো পাওয়া যাচ্ছে। অথচ নীহারিকাগুলি এত দূরে যে সেখানকার আলোক আমাদের নিকট পৌঁছে, দু'দশ দিনে নয়—পাঁচ ছয় কোটি বছরে। এজন্য আলাদিনের দৈত্যেরও অগোচর স্থান ও কালের বিচার করা

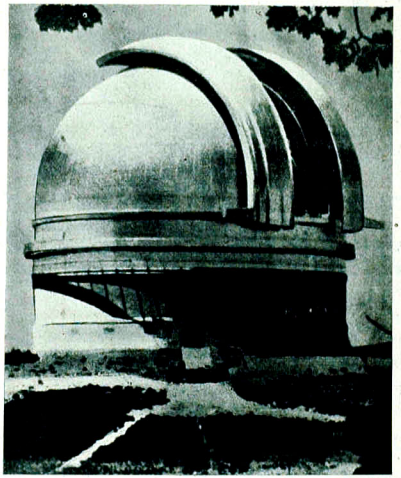

ক্যালিফর্ণিয়া স্থান ডায়েগোর উনসত্তর মাইল উত্তরে Palamar পাহাড়ের উপর এই মানমন্দির নির্ম্মিত হচ্ছে। এই মানমন্দিরে দু'শ ইঞ্চির প্রতিফলক-কাচ যুক্ত করা হবে। এর নাম হবে 'Hale observatory'.

আবশ্যক হয়েছে। এজন্য নাক্ষত্রিকগণ গণিতের সংখ্যাকে ছোট করে' একটা মানদণ্ড ঠিক করবার এক নতুন ফিকির করেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা আলোর গতির হিসেব থেকে এক একটি "রশ্মি বছরকে" মাপের কাঠি করেছেন। প্রতি সেকেণ্ডে আলো চলে এক লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল—তাতে এক

বছরে তা' চলে ছয় লক্ষ কোটি মাইল। এটা হ'ল মাপের কাঠি। এমনি করে' আকাশের অফুরন্ত রাজ্যকে পরিমাপ করে' জ্যোতির্ব্বিদ্‌রা অগ্রসর হয়েছেন। এক রশ্মিবছর বলতে ছয়লক্ষ কোটি মাইল বোঝায়।

পৃথিবীর বৃহত্তম মানমন্দির ১৫০ কোটি নক্ষত্রের খোঁজ পেয়েছে। নক্ষত্র জগৎগুলি বহু দূর ও ব্যবধানে অবস্থিত। সূর্য্যকে ছাড়িয়ে ২৫লক্ষ কোটি মাইল দূরে অন্য নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। নক্ষত্র জগতের কেন্দ্র হ'তে সূর্য্যের দূরত্ব ৪০ হাজার রশ্মি-বছর। অনেক নক্ষত্র সূর্য্য হ'তেও বড় ও অধিকতর উষ্ণ। উষ্ণ নক্ষত্রগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান শীতল হওয়া স্বাভাবিক, এজন্য সব নক্ষত্র প্রাণীর বাসস্থান হ'তে পারেনা। যে সব ক্ষেত্র নাতিশীতোষ্ণ সেখানেই জান্তব সৃষ্টি সম্ভব হ'তে পারে।

আকাশের অসীম ক্রোড়ে অগণিত ছায়াপথ-বেষ্টিত নক্ষত্রলোক বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে মেঘের মত যে সব আলোকাবর্ত্ত দেখা যায় সেগুলিকে নীহারিকা বলা যেতে পারে। প্রত্যেক নীহারিকার ওজন সূর্য্যের হাজার কোটি গুণ এবং প্রত্যেকটিতে হাজার কোটি সূর্য্য তৈরী হওয়ার উপাদান আছে। ডাক্তার হাচলের মতে এ রকমের ২০লক্ষ নীহারিকা আকাশে ছড়ান আছে। যে দ্রুত হাউই এক সপ্তাহে সূর্য্যকে অতিক্রম করতে পারে তাকে একটি নীহারিকার এক দিক হতে অন্য দিকে পৌছাতে একহাজার কোটি বছর লাগে। এতেই আকাশলোকের বিস্তৃতির কথা উপলব্ধি হবে।

এক রকমের নীহারিকা হচ্ছে দূরবিস্তৃত বাষ্পে ঘেরা এক একটি নক্ষত্র। এসব অত্যন্ত উষ্ণ, প্রায় সত্তর, পঁচাত্তর হাজার ডিগ্রী হ'ল এদের উত্তাপের পরিমাণ। আবার কোনো কোনো নীহারিকার ভিতর একাধিক নক্ষত্র আছে। এগুলি যেন বাষ্পে মাখা মনে হয়। দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখলে এসব ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়। ছায়াপথের বেষ্টনীর বাইরে যে নীহারিকা দেখা যায় তা' জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের অবাক্ করে' দেয়। সৌরজগৎ দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সমবায়ে সৃষ্ট হ'লে এসবকেও হত সেরকমের এক একটা জগৎ বলতে হবে। দশ কোটি রশ্মি বছরের ("Light year") বাইরের জগৎ দেখবার যন্ত্র এখনও তৈরী হয়নি। ২০০ইঞ্চি কাচের যে দূরবীক্ষণ তৈরী হচ্ছে তাতে আরও কিছু নূতন খবর পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই। ছায়াপথের বাইরের এসব নীহারিকা-জগৎ ব্যাপকত্বে সকলকে স্তম্ভিত করে' দেয়। রশ্মিবছরের মাপও যেন এখানে সংক্ষেপ হয়ে যায়। যে বিশ লক্ষ নীহারিকাচক্র আকাশে ভাসমান তাদের পরস্পরের দূরত্ব বিশ লক্ষ রশ্মি-বছর। প্রত্যেক নীহারিকার আবর্ত্তন আছে—তা' স্থান্থ নয়। এণ্ড্রোমেডার নীহারিকা এত বৃহৎ যে তাকে একবার আবর্ত্তিত হ'তে দু'কোটি বছর লাগে।

উত্তাপ সম্বন্ধে একবার আলোচনা করা যাক। সূর্য্য একটা বিরাট অগ্নিকটাহের মত। অফুরন্ত তাপ আর আলোক এই পিণ্ড হ'তে নির্গত হয়ে দিক্‌দিগন্তে ছড়াচ্ছে। সূর্য্যের উপর-কার তাপ ৬০০০ডিগ্রী—কিন্তু ভিতরের তাপ পাঁচ ছয় কোটি ডিগ্রী। নীহারিকাগুলির উপরকার তাপ ৭০,০০০ ডিগ্রীর কম নয়। বলা হয়েছে এক একটা নীহারিকায় হাজার কোটি সূর্য্য তৈরী হওয়ার উপাদান আছে। কাজেই উত্তাপের অফুরন্ত অনাদি উৎস অহরহ আকাশে ঘূর্ণিত হচ্ছে।

নক্ষত্রদের ভিতর সূর্য্য একটা ক্ষুদ্র সৃষ্টি—এটা একটা "dwarf star". অথচ এর ব্যাস হচ্ছে ৮৬৪,০০০ মাইল। এর উপরকার আবরণ ছোট ছোট চালের মত grainএ পূর্ণ। সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যকে পর্য্যবেক্ষণ সহজ হয়—এ অবস্থায় ফটোও নেওয়া হয়। ঠিক এসময় লক্ষ মাইল ব্যাপক ও দীর্ঘ লাল আগুনের জলন্ত শিখা-পর্য্যায় সূর্য্য হ'তে বেরিয়ে আসতে দেখতে পাওয়া যায়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে সূর্য্যগ্রহণ হয় তাতে এরকমের লাল আগুনের হিমাদ্রি অপেক্ষা অধিক উচ্চ ও প্রকাণ্ড শিখারাশি উদ্গত হ'তে দেখা যায়। শিখাগুলি ১৩০,০০০ হতে ৫০০,০০০ মাইল উঁচু ছিল। কাজেই ক্ষুদ্র হিমালয়কে এরকমের বিরাট ও বিশ্বগ্রাসী অগ্নিশিখার সঙ্গে তুলনা

চন্দ্রের পশ্চাদ্‌ভাগ

করলে একটা বিদ্রূপ করা হয় মাত্র। সূর্য্যের কলঙ্কগুলি (Sun-spots) চৌম্বক কেন্দ্র বা Magnets বলে' সাব্যস্ত করা হয়েছে। সূর্য্যের অবস্থা বাষ্পীয় এজন্য কোন দৃঢ় সীমা এর নেই। পৃথিবী সূর্য্যের একবর্গ ইঞ্চি হ'তে যতটুকু energy পায় তার মূল্য Board of Tradeএর unit হিসেবে (১ পেন্স্ প্রত্যেক unitএ) ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড হয়। সূর্য্যের ঘনত্বের পরিমাপ হচ্ছে ২,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন। এক কোটি ষাট লক্ষ বছর রশ্মি বিকীরণ করার পরিমাণ energy সূর্য্যের আছে।

চন্দ্র সম্বন্ধেও প্রচুর গবেষণা হয়েছে। প্রচুর পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ চন্দ্রের অবয়বে গোলাকার বহু গিরিমালা আছে। তাদের বৃহত্তম হচ্ছে ১০০ মাইল ব্যাপী। সব চেয়ে বড় গিরিলোককে

"Archmedes" বলা হয়। এর ভিতর প্রচুর সঙ্কীর্ণ উপত্যকাও আছে। চন্দ্র আমাদের প্রিয়, কারণ এ জ্যোতিষ্কটি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পৃথিবী হতে ৩০,০০০ মাইল দূর হ'তে চাঁদ আমাদের হা-হুতাশের উপকরণ জোগাচ্ছে। চাঁদের মত পঞ্চাশটি জ্যোতিষ্ককে পৃথিবী নিজের ভিতর গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর ওজন চাঁদের অপেক্ষা ৮২ গুণ বেশী। এর এক একটি শৈলচূড়া ৫০০০ ফিট উঁচু। Tycho হচ্ছে একটি বিখ্যাত চূড়ার নাম। প্রদত্ত চিত্রের পূর্ব্বাংশের উপরিভাগকে বলা হয় "শান্তি সাগর" (Sea of Serenity) এবং নীচের ভাগকে বলা হয় "প্রশান্ত সাগর" Sea of tranquility. এসব নবতম যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে।

শুক্রগ্রহ নিয়েই নানা আখ্যান-উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে। সূর্য্য হ'তে দূরত্ব হিসেবে শুক্রগ্রহের স্থান চতুর্থ। শুক্রের দৃঢ় সমতলভূমি, শীতগ্রীষ্ম ও আব্‌হাওয়ার বেষ্টন প্রভৃতি সকলের আলোচনার বিষয় হয়েছে। এখানকার সরলরেখার মত বিস্তৃত Canalগুলি দেখে সকলে মনে করে এই গ্রহে বুদ্ধিমান জীব আছে। কাজেই সে জীবের সঙ্গে সামাজিকতা অসম্ভব নয়। বার বার চেষ্টা করেও নানা সঙ্কেত প্রেরিত হয়েছে কিন্তু কোনো প্রতিসঙ্কেত পাওয়া যায়নি। শুক্রগ্রহের ব্যাস পৃথিবীর অর্দ্ধেক মাত্র। সহস্র সহস্র মাইল বিস্তৃত রেখাগুলিকে Canal সাব্যস্ত করার মূলে কারণ আছে। শুক্রগ্রহে মেঘাড়ম্বর প্রচুর। Oxygen ও জলীয় বাষ্পও এই গ্রহে আছে। পৃথিবীর অপেক্ষা শুক্র অধিকতর ঠাণ্ডা কারণ সূর্য্য হ'তে অধিক দূরে এটি অবস্থিত। শুক্রের উষ্ণতা উর্দ্ধে ৫০° ডিগ্রী (F) ও নিম্নে ১৩০ ডিগ্রী। কাজেই এখানে জীবের বাস একেবারে অসম্ভব নয়।

Mercuryতে কোন আবহাওয়া নেই এবং গ্রহটির উত্তাপও গলিত দস্তার মত। জুপিটার ও শনিতে Oxygen ও জলীয় বাষ্প নেই, কাজেই এ দু'জায়গায় বাস করা সম্ভব নয়। Venus ও Neptune প্রচুর ঠাণ্ডা—Plutoতে আবহাওয়া নেই। Venusএর উপর মেঘের গাঢ় আবরণ সব সময় পাওয়া যায়। Oxygen ও জলীয় বাষ্প এ গ্রহে মোটেই নেই। সূর্য্যের চারিদিকে যে নয়টি গ্রহ ঘুরছে তাদের সূর্য্য হ'তে দূরত্ব দেওয়া যাচ্ছে :—

Mercury	তিন কোটি ষাট লক্ষ	মাইল।	
Venus	ছয়	„ সত্তর „	„
Earth	নয়	„ ত্রিশ „	„
Mars	চৌদ্দ	„ কুড়ি „	„
Jupiter	আটচল্লিশ	„ ত্রিশ „	„
Saturn	আটাশী	„ ষাট „	„
Uranus	একশো আটাত্তর	„ ত্রিশ „	„
Neptune	দু'শো উনআশী	„ চল্লিশ „	„
Pluto	তিনশো সাতষট্টি	„ দশ „	„

আমাদের সব চেয়ে নিকটে হল চন্দ্র। সূর্য্য নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে এবং আমাদের নিকটতম নক্ষত্র হচ্ছে ২৫,৫০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে। কাজেই সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন খুব কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই।

সহরতলী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

এক

একদিন শীতের সকালে যশোদার লাথিতে তার রান্নাঘরের প্রকাণ্ড উনুন তিনটি ভাঙ্গিয়া গেল। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার সময় নাকি উনুন ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইতে হয়।

মেয়েলি শাস্ত্রের এসব বিধান যশোদা যে বিশেষ মানিয়া চলে তা নয়, তা ছাড়া লাথি দিয়া উনুন ভাঙ্গিতে হইবে এমন কোন নির্দ্দেশও এ শাস্ত্রে নাই। তবে, মন ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষের পক্ষে উনুন ভাঙ্গিবার জন্য এরকম খাপছাড়া উপায় অবলম্বন করা আশ্চর্য্য নয়।

উনুন ভাঙ্গিল, একটি পা-ও জখম হইল যশোদার। লোহার একটা শিক ডান পায়ের পাতায় এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। মন-ভাঙ্গা আবেগে লাথিগুলি যশোদা একটু জোরে জোরেই মারিয়াছিল।

মেঝেতে বসিয়া নিজেই সে টান দিয়া শিক খুলিয়া ফেলিল। তখন আরম্ভ হইল রক্তপাত। কত রক্তই যে ছিল যশোদার প্রকাণ্ড শরীরটাতে, দেখিতে দেখিতে রক্তে মেঝে ভাসিয়া গেল।

বগল-লাঠিতে ভর দিয়া এক পায়ে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ধনঞ্জয় যশোদার কীর্ত্তি দেখিতেছিল, তার দিকে চাহিয়া যশোদা বলিল, 'দেখলে ?'

রক্ত দেখিয়া ধনঞ্জয় প্রথমটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল। পা কাটা যাওয়ার পর কিছুদিন সে সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, রাগারাগি চেঁচামেচি করিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিত, কত যে ছেলেমানুষী আর পাগলামী আসিয়াছিল হিসাব হয় না। তারপর ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সবসময়েই প্রায় বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকে, অথচ কোন বিষয়ে সে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে তাও মনে হয় না। ডাকিলে চমকাইয়া ওঠে না, ডাক সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হইয়া ওঠে, সাড়া দিতে একটু সময় লাগে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া যেন আজকাল তার একটু শ্লথ গতিতে সম্পন্ন হয়। সোজা কথায়, ধনঞ্জয় একটু বোকা হাবার মত হইয়া পড়িয়াছে।

যশোদার পা জখম হইয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে এটা খেয়াল করিয়া উঠিতে একটু তার সময় লাগে কিন্তু তারপর চোখের পলকে ঝিমানো মানুষটা যেন অতিমাত্রায় সজীব হইয়া ওঠে। বগলের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে কাছে আগাইয়া যায়, গায়ের নূতন আলোয়ানটি দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে ব্যাকুলভাবে বলে, 'ডাক্তার ডেকে আনি ?'

আলোয়ানটি কাড়িয়া নিয়া যশোদা বলে, 'ডাক্তার না হাতি ডাকবে। জল আনো এক ঘটি আর খানিকটা ন্যাকড়া।'

ধনঞ্জয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে, একপায়ে দুয়ারের কাছে গিয়া বগল-লাঠি তুলিয়া নিতে

গিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িবার উপক্রম করে। যশোদা ডাকিয়া বলে, 'হুটোপুটি ক'রো না বাপু, ধীরে সুস্থে আনো।'

'রক্ত পড়ছে যে গো?'

'আর রক্ত পড়ছে না, টিপে ধরে' আছি।'

ধনঞ্জয় জল আর ন্যাকড়া আনিতে যায়, পায়ের পাতার ফুটা টিপিয়া ধরিয়া রাখিয়া যশোদা চাহিয়া থাকে উনুনের ভগ্নস্তূপের দিকে। একদিন দু'বেলা এই উনুনে বিশ পঁচিশ জনের রান্না করিত যশোদা, কুলি মজুরের ভাত, যশোদা যাদের আপন করিতে গিয়াছিল। আজ তারা সকলেই তাকে ত্যাগ করিয়াছে, বাড়ীতে তার মানুষ নাই। পরের বাড়ীর একটা মেয়েকে চুরি করিয়া ভাইটা পর্য্যন্ত তার উধাও হইয়া গিয়াছে।

এদিকে ধনঞ্জয় চেঁচামেচি আরম্ভ করে, 'ও চাঁদের মা, ন্যাকড়া যে পাচ্ছি না?'

'ছোট টিনের তোরঙ্গে ছেঁড়া কাপড় আছে একটা, সেইটে নিয়ে এসো।' বুলিয়া যশোদা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। টিনের তোরঙ্গটি যে চাবি বন্ধ আছে, ধনঞ্জয় খুলিতে পারিবে না, একথা যশোদার মনে আছে। তবু যশোদা আর সাড়াশব্দ দেয় না, পায়ের ক্ষত হইতে আঙুলের ছিপি খুলিয়া আনিয়া রক্তপাতের পথটাও মুক্ত করিয়া দেয়। এ একটা সাময়িক মানসিক বিলাস ভাঙ্গা মনের। নিজেকে আঘাত করিতেও সময় বিশেষে মানুষের বড় ভাল লাগে, নিজের লাল রক্তের অপচয়ও ভাল লাগে।

কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়া ধনঞ্জয়ও চুপ করিয়া যায়, খানিক পরে জলের ঘটি আর ছেঁড়া কাপড় হাতে করিয়া আসিয়া যশোদার কাণ্ড দেখিয়া আবার ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

'টিপে ধর, টিপে ধর, শীগ্‌গির টিপে ধর।'

যশোদা করুণভাবে একটু হাসিয়া বলে, কি করে' খুললে বাস্‌কো?'

'টেনে খুলেছি।'

'তার মানে বাস্‌কোর তালাটি ভেঙেছ।'

পায়ে একটা লোহার শিক বিঁধিয়া যাওয়া বাধা হিসাবে গণ্য করিবার মত গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার আর সব ব্যবস্থাই যখন হইয়া গিয়াছে, বাড়ীটা বিক্রয় করিতে পর্য্যন্ত বাকী আছে কেবল হাতে টাকাটা পাইয়া দলিল রেজেষ্ট্রী করা, ভারি ভারি জিনিষপত্র প্রায় সমস্তই পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে সহরের অপর প্রান্তের সহরতলীর ভাড়াটে বাড়ীতে, রওনা হওয়ার আয়োজন আসিয়া ঠেকিয়াছে গাড়ী ডাকিয়া বাকি জিনিষপত্র নিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসার পর্ব্বে, তখন পায়ে শিক বেঁধাকে উপলক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বাঁকিয়া বসার কোন অর্থ হয় না। যে সব কারণে যশোদা বাড়ী ছাড়িয়া এদিকের সহরতলী ছাড়িয়া জন্মের মত চলিয়া যাইতেছিল, পা একটু জখম হওয়ায় তার একটিও বাতিল হইয়া যায় নাই। শেষ মুহূর্ত্তে যশোদা ওই ছুতায় যাওয়াটাই বাতিল করিয়া দিল।

আশাপূর্ণা দেবী
৪৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

ধনঞ্জয় বলিল, 'গাড়ী ডাকি?'

যশোদা বলিল, 'থাক। যাব না।'

ধনঞ্জয় বলিল, 'আমিও তো তাই বলছি। তাড়াহুড়োর কি আছে? পায়ের ব্যথাটা কমুক, দু'দিন পরে গেলেও চলবে।'

বলিতে বলিতে ধনঞ্জয়ের মুখে ম্যাজিকের মেঘের মত বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। —'তোমার পা দু'দিন পরে সেরে যাবে, আমার পা কিন্তু কোনদিন ঠিক হবে না চাঁদের মা।'

অনেকদিন যশোদা ধনঞ্জয়ের মুখে তার কাটা পায়ের জন্য নালিশ শোনে নাই, বিষাদের ছাপটা যদিও চোখে পড়িয়াছে সব সময়েই। হাঁটুর নীচেই ডান পা'টি ধনঞ্জয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, ঘা শুকাইয়া খানিকটা মসৃণ হইয়াছে, বাকীটা হইয়া আছে এবড়ো-খেবড়ো। দেখিলে যশোদার এখনো বেদনা আর বিতৃষ্ণা মেশানো একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, কতকটা প্রিয়জনের মৃতদেহ দেখিয়া বিব্রত হওয়ার মত।

'আমারও ডান পা'টা জখম হয়েছে, দেখেছ?'

এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই, এবার খেয়াল করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য যোগাযোগে ধনঞ্জয়ের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

'হয়তো আমার পা'টাও তোমার মত কেটে বাদ দিতে হবে।'

'না না, তা কি হয়, কি যে বল তুমি চাঁদের মা!'

'হতে পারে তো? পা'টা যদি পেকে ফুলে ওঠে, তারপর পচে গলে যায়, তারপর ডাক্তার করাত দিয়ে কেটে তোমার পায়ের মত করে' দেয়, বেশ হয় তা হ'লে, না?'

কথা শুনিলে আর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিলে মনে হয় যশোদার মনে বুঝি ঘোরতর বিকার আসিয়াছে। পায়ের পাতায় তার যেভাবে আঘাত লাগিয়াছে তাতে পা'টি পাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে অবশ্য পারে এবং শেষ পর্য্যন্ত কাটিয়া পায়ের খানিকটা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হওয়াও আশ্চর্য্য নয়, সামান্য আঁচড় লাগিয়াও সময় সময় ওরকম হয়। কিন্তু সেটা যে বেশ হয়, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে তারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একটা সামঞ্জস্য ঘটিবে শুধু এই জন্যই, এরকম ছেলেমানুষী কথা যশোদার মুখে মানায় না। কথাটা সে বলে রীতিমত আবেগের সঙ্গে, সেটা তার পক্ষে আরও বেশী অস্বাভাবিক, সেইজন্য মনে হয় সে যেন তামাসা করিতেছে।

'আমার সঙ্গে তামাসা করছ চাঁদের মা?'

শুনিয়া গম্ভীর হইয়া যশোদা বলে, 'না, তামাসা করিনি। মনটা ভাল নেই কিনা, তাই কি বলতে কি বলেছি। বাড়ী-ভরা লোক ছিল আমার, তুমি ছাড়া আজ কেউ নেই। আমার কি অদেষ্ট বলত?'

চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে যশোদার আর বিহ্বলের মত তাই দেখিতে থাকে ধনঞ্জয়। যশোদার মুখ সে গম্ভীর হইতে দেখিয়াছে, সহানুভূতিতে কোমল হইতেও দেখিয়াছে, কিন্তু সে মুখে বিষণ্ণতা কোনদিন নজরে পড়ে নাই। যশোদা যে কাঁদিতেও পারে, আর দশজন

সাধারণ মেয়েমানুষের মত দুঃখে জল আসিতে পারে তারও চোখে, কেবল ধনঞ্জয় নয়, যশোদাকে যারা চেনে তাদের প্রায় সকলের পক্ষেই এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

শূন্য বাড়ীতে শূন্য ঘরে খালি তক্তপোষের দুই প্রান্তে দু'জনে বসিয়া ছিল। তক্তপোষের বিছানাপত্র গুটাইয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র যশোদা পা জখম হওয়ার আগেই রোয়াকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে। ধনঞ্জয় সরিয়া সরিয়া যশোদার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিল, কোঁচার খুঁট দিয়া যশোদার চোখ মুছাইয়া দিল। যশোদার চোখ দিয়া জল পড়া যেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার, ধনঞ্জয়ের কাণ্ডটা তার চেয়ে কম নয়। অন্য সময় এত সাহস ধনঞ্জয়ের হইত না।

মানুষটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়ার বদলে যশোদা তার হাত নামাইয়া ধরিয়া রাখিল, বলিল, 'হয়েছে। কচি খুকি না কি আমি, আদর করে' কান্না থামাচ্ছ ?'

বেলা অনেক হইয়াছে, কিন্তু এখনো যশোদার উঠানে ভাল করিয়া রোদ আসে নাই। পুবে একটি নূতন তিনতলা বাড়ী উঠিয়াছে, যশোদার বাড়ীটি পড়িয়া গিয়াছে আড়ালে। নূতন মালিকের সোহাগে চারিদিকে বাড়ী যেন মাথা তুলিতেছে বর্ষাকালের আগাছার মত। আর কতটুকু সময়ের মধ্যেই প্রকাণ্ড এক একটা বাড়ী সম্পূর্ণ হইতেছে। কোন কাজেই মানুষের যেন আজকাল আর সময় লাগে না—সহরের মানুষের। নূতন যুগের নূতন মন্ত্রে ম্যাজিকের মত কাজ হইয়া যায়।

ঘরের মধ্যে যশোদার শীত করিতেছিল আর তাকে পীড়ন করিতেছিল ঘরের রিক্ত নগ্নতা। মেঝেতে ছড়ানো পড়িয়া আছে জঞ্জাল, একটুকর ছেঁড়া কাগজ যশোদা ঘরে জমিতে দিত না, যা কিছু অকেজো, যা কিছু পরিত্যক্ত সব যশোদা চিরদিন নির্দ্বিকার চিত্তে ফেলিয়া দিয়াছে,—যদি কাজে লাগে ভাবিয়া ঘরের জঞ্জাল সঞ্চয় করার মত ভীরু মানুষ যশোদা নয়। তবু, দুঃসাহসীর মনের গোপন ভীরুতার মত এত জঞ্জাল যে ঘরের কোথায় লুকাইয়া ছিল! শূন্য দেয়ালে শুধু নানা রকম দাগ আর একটি পুরানো বাংলা দেয়ালপঞ্জী, জীবনবীমা কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। দেয়ালপঞ্জীর ছবিটিতে একজোড়া নারীপুরুষ ও তাদের গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ের দেহে স্বাস্থ্য আর মুখে আনন্দের হাসি যেন ধরিতেছে না। প্রথমে ছবিটা দেখিলেই যশোদার রাগ হইত, মনে হইত রেষারেষি করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া দিয়াই মানুষ আজকাল মিথ্যাকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া তুলিতেছে, সর্ব্বত্র ঢাঁড়াইয়া দিতেছে। অনেক বিষয়ের মত এবিষয়েও যশোদার একটি নিজস্ব মতামত আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর বিশ্লেষণ অবশ্য যশোদার মতামতের পিছনে নাই, পাণ্ডিত্যের ফেনা সঞ্চয় করিবার সুযোগ ও তার ঘটে নাই মুখে ফেনা তুলিয়া জাবর ও সে কাটে না, কাজে লাগায় শুধু নিজের উপলব্ধি ও সাধারণ বুদ্ধিকে। প্রচারের আশ্রয়ে মিথ্যা যে পুষ্ট হয় একথা বুঝিতে যশোদার গভীরভাবে ভাবিবার দরকার হয় নাই। তারপর ধীরে ধীরে চোখে সহিয়া আসিলে ছবিটির বিজ্ঞাপনের ছাপ যশোদার কাছে মুছিয়া গিয়াছে, জীবনবীমা কোম্পানীর দেয়ালপঞ্জীর ছবি তার কাছে হইয়া দাঁড়াইয়াছে অজানা শিল্পীর আঁকা একটি অবাস্তব মধুর কল্পনা।

'আগে ঘরদোর ভাল করে' সাফ করিয়ে তারপর জিনিষপত্র ঘরে ঢোকাব, কেমন ?'

ধনঞ্জয় সায় দিয়া বলিল, 'আচ্ছা। কাকে দিয়ে সাফ করাবে, তুমি তো পারবে না ?'

'কেন পারব না ? কি হয়েছে আমার ?'

'না না, তুমি আজ আর উঠো না চাঁদের মা। বিছানাটা এনে পেতে দি', শুয়ে থাকো।'

শুইয়া থাকার প্রস্তাবে যশোদা উঠিয়া দাঁড়াইল, একপায়ে ভর দিয়া। একটু হাসিয়া বলিল, 'এখানে শীত করছে, রোদে বসি গে' চল বাইরে।'

উঠানের একপাশে একটু রোদ আসিয়াছিল, সেইখানে একটা ভাঙা তক্তায় বসিয়াই যশোদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, নন্দের তো জেল হবে ?'

ধনঞ্জয় বলিল, 'মেয়েটির বাড়ীর লোকে যদি গোলমাল করে—'

দিন চারেক আগে সুবর্ণ আর নন্দ উধাও হইয়া গিয়াছে, সুবর্ণের বাড়ীর লোকেরা কি করিয়াছে যশোদা কিছুই জানে না। জ্যোতির্ম্ময় একবার আসিয়া জিজ্ঞাসাও করে নাই, তার বোনটিকে সঙ্গে করিয়া নন্দ কোথায় গিয়াছে খবরটা কি যশোদা রাখে ? হয়তো জ্যোতির্ম্ময় খুসিই হইয়াছে, হয়তো চারিদিকে খোঁজ করাইতেছে, দু'জনের উদ্দেশ পাইলেই নন্দকে জেলে পাঠাইয়া ছাড়িবে। সুবর্ণের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে সেই জানে। হয়তো দূরে কোন আত্মীয়ের কাছে পাঠাইয়া দিবে, হয়তো কোন বোর্ডিং-এ রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবে, হয়তো মেয়ের এই কীর্ত্তিকথা গোপন করিয়া চুপি চুপি কারও সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিবে—তারপর যা হবার হোক।

এসব কথা যশোদা আজ ক'দিন ধরিয়া ভাবিতেছে। নিজেকে সে বলিয়াছে যে, নন্দ জেলে যাক, চুলোয় যাক, যমালয়ে যাক তার আর কিছু আসিয়া যায় না। নচ্ছারটার সঙ্গে আর তার কোন সম্পর্কই নাই। তবু মাঝে মাঝে যশোদার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, একা নন্দই কি দোষী ? এই কেলেঙ্কারির জন্য সুবর্ণের কি কোন দোষ নাই ? সুবর্ণ ছেলেমানুষ কিন্তু অমন ভাবপ্রবণ, ফাজিল আর পাকা মেয়েকে ভুলাইয়া চুরি করিয়া পালানোর সাহস কি নন্দের হওয়া সম্ভব ? কাঁচপোকার আসোলাকে টানিয়া নিয়া যাওয়ার মত সুবর্ণই নন্দকে টানিয়া নিয়া গিয়াছে, দোষটা চাপিবে একা নন্দের ঘাড়ে।

ফিরিয়া আসিলে দু'জনের বিবাহ দিয়া দেওয়া যায় না ? জ্যোতির্ম্ময়ের কাছে গিয়া কথাটা আগে হইতে আলোচনা করিয়া আসিলে হয়তো সে ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজী হইয়া যাইতেও পারে। এ বিবাহ অবশ্য সুখের হইবে না, কিন্তু এই কুৎসিত ব্যাপারের জের টানিয়া চলার চেয়ে তাও অনেক ভাল।

এবেলা যশোদা আর রান্নার ব্যবস্থা করিল না। একটু ঘোঁড়াইতে ঘোঁড়াইতে গিয়া দু'জন লোক ডাকিয়া আনিয়া, নিজেও কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর-দুয়ার ধোয়ামোছা আরম্ভ করিয়া দিল। বেলা তিনটার সময় দইচিড়ার ফলারে পেট ভরাইয়া মাটি ছানিয়া রান্নাঘরে তৈরী করিতে বসিল ছোটখাট একটি উনুন।

সব কাজে সাহায্য করিতে গিয়া ধনঞ্জয় সারাদিন আজ যশোদার বকুনি শুনিয়াছে, উনুন তৈরী করিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া বলিল, 'দুচার দিনের জন্যে আবার উনুন পাতছ কেন ?'

ইটের উপর আড়াআড়িভাবে শিক বসাইতে বসাইতে যশোদা বলিল, 'দু'চার দিন কেন ?

থাকতে হ'লে রেঁধেবেড়ে খেতে হবে তো? না, ফলার করব রোজ?'

'ক'দিন থাকবে?'

'চিরকাল থাকব।'

'এখান থেকে যাবে না?'

'কেন যাব?'

'বাড়ী বেচবে না?'

'কেন বেচব?'

'ওবাড়ীতে যে মালপত্র গেছে?'

'আনিয়ে নেব। ওবেলা কেদারকে বললেই হবে। তিনটে গরুর গাড়ীতে মাল গেছে, একেবারে একটা লরীতে মাল ফেরৎ আসবে।'

ধনঞ্জয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। যশোদার খেয়ালের আদি-অন্ত পাওয়া ভার। বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না শুনিয়া মুখখানা তার বিমর্ষ হইয়া যায়। নন্দ চলিয়া যাওয়ার পর এ বাড়ীতে কেবল সে আর যশোদা ক'দিন বাস করিতেছে। প্রথম রাত্রে নন্দ ফিরিবে কি ফিরিবে না একথা কারও জানা ছিল না, কোন কারণে ফিরিতে তার দেরী হইতেছে ভাবিয়া যে যার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, নিশ্চিন্ত মনে প্রতিদিনের মত ঘুমও আসিয়াছিল দু'জনের। পরদিন যশোদার-সই আর শত্রু কুমুদিনী আসিয়া বলিয়াছিল, 'আমি থাকব ভাই তোর কাছে রাত্রে?'

যশোদা রাজী হয় নাই। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একা একবাড়ীতে রাত কাটানোর ভয়াবহ পরিণামের কথা বারবার মনে পড়াইয়া দিয়া কুমুদিনী যশোদাকে কাবু করিতে চাহিয়াছিল, যশোদা হাসিমুখে বলিয়াছিল, 'আমার শুনাম দুর্নামে কার কি আসবে যাবে বল্, কে আছে আমার? দুর্নাম হতে বাকীই বা কি আছে বল্?'

শেষ পর্য্যন্ত রাগ করিয়া গালাগালি আর অভিশাপ দিতে দিতে কুমুদিনী চলিয়া গিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যার পর ধনঞ্জয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি তোমার ঘরে শোব যশোদা? তোমার ভয় করবে না তো?'

'ভয় করবে?'—যশোদা অবাক হইয়া গিয়াছিল, 'আমার ভয় করবে একা শুতে?'

ধনঞ্জয় আর কথা বলিতে পারে নাই। যশোদাকে বুঝা যায় না, যশোদার খেয়ালের অন্ত পাওয়া যায় না। সহরের অন্যপ্রান্তে নূতন একটি বাড়ীতে যশোদার সঙ্গে উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে ধনঞ্জয় হয়তো অনেক কিছু রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা আবিষ্কার করিতেছিল, যাওয়া হইবে না শুনিয়া সে মুষড়াইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর কেদার আসিল। লরীতে চাপাইয়া রাতারাতি মালপত্র ফিরাইয়া আনিবার অনুরোধে সে একটু হাসিল। বলিল, 'রাত্তিরে হাঙ্গামা করবার দরকার কি চাঁদের মা? আমি গিয়ে রাত্তিরটা থাকছি সেখানে, ভোর ভোর মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, এঁ্যা?'

'কেন, সেখানে রাত কাটাবার তোমার দরকার? হরণাম সিংকে বলোগে' আমার নাম

করে' গাড়ী আর লোকজন নিয়ে গিয়ে সেই সব ব্যবস্থা করে' দেবে, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। সকালে ওর গাড়ী পাওয়া যাবে না।'

'কি বকশিস্ দেবে আমাকে?'

'রাত্তিরে থেকো আমার কাছে।'

কেদার হাসিমুখে চলিয়া গেল। চিরদিন হাসিমুখেই কেদার যশোদার কাজ করিয়া দেয়,—কুমুদিনীকে ফাঁকি দিয়া। যশোদার সঙ্গে কেদার মেলামেশা করিবে কুমুদিনী এটা পছন্দ করে না, দু'জনকে কথা বলিতে দেখিলে সে রাগিয়া আগুন হইয়া যায়। দিনান্তে একবার যশোদা কাছে না আসিলে আর খানিকক্ষণ ঝগড়া করিয়া না গেলে কুমুদিনীর ভাল লাগে না, সারারাত মেজাজ এমন গরম হইয়া থাকে যে কেদারের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

কেদার বাহির হইয়া যাওয়া মাত্র ধনঞ্জয় ফোঁস করিয়া উঠিল, 'ওকে শুতে বললে যে তোমার ভয়?'

লণ্ঠনের আলোয় ধনঞ্জয়ের মুখ দেখিয়া যশোদা রাগ করার বদলে শান্তভাবেই বলিল, 'মাথা খারাপ না কি তোমার? তাম্সা বোঝ না?'

ধনঞ্জয় অবুঝ শিশুর মত আব্দার ধরিয়া বলিল, 'আমি তোমার ঘরে শোব।'

যশোদা শুধু বলিল, 'শুয়ো।'

ক্রমশঃ

ট্যাক্সি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ডায়োসেশনে-পড়া মেয়ে
পড়েছে গরিবের হাতে :
বলেছিলো, মোটরে করে' বেড়িয়ে আনতে একদিন
লেক হয়ে ট্র্যাণ্ড দিয়ে
বাগবাজারের পুল পেরিয়ে
আলমবাজার হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
সাত দিন ধরে' গাড়িটা হয়েছে বিকল
সারতে গিয়েছে কারখানায়।
তাই নিলুম একটা ঢাকা ট্যাক্সি
ফুরন করে'।

যেতে-যেতে ইটলির বাজারের কাছে
নেমে এলো বৃষ্টি :
চক্ষু-ধাঁধানো জ্বলন্ত অনর্গলতা।

কোথায় সেই নারকোলডাঙা,
আর কী সর্পিল সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যেই তার বাসা।
এক পাশে খোলার চালের বস্তি
আরেক পাশে কাঁচা মাটির খোলা নর্দমা।
পেলুম খুঁজে নম্বর :
এক ফালি রোয়াকে একতলা একটি বাক্স।
সামনের এক টুকরো জমিতে
জিনিয়া আর জিরিনিয়ম রয়েছে ফুটে ;
ছেঁচা বাঁশের বেড়া-দেয়া।
ডায়োসেশনে-পড়া মেয়ে
পড়েছে গরিবের সংসারে।

গিয়ে দেখি বিছানায় শুয়ে আছে অমলা
পাড়-দিয়ে-সেলাই রঙ-বেরঙা কাঁথা গায়ে দিয়ে
একলা বালিসে উস্কখুস্ক শুকনো চুলের বোঝায় ;
বিস্মৃত মুখে লেখা যত অস্ফুদিত স্বপ্ন।
সেবমান স্বামী শিয়রে বসে' নীরবে দিচ্ছে জল-পটি,
কখনো বা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কানের দু'-পাশটিতে।
চিনলো কি চিনলো না তা কে জানে,
চোখের দিকে চেয়ে অস্ফুট গলায় বললে, 'ডবল নিমোনিয়া'।
ভাবলে বুঝি বা অসময়ের বন্ধু
ঈশ্বর-পাঠানো।

আমি যাচ্ছিলুম চলে'
ফুরন-করা ঢাকা ট্যাক্সিতে,
ঘুমের মধ্যে থেকে কিকিয়ে উঠলো অমলা,
'চা করে' দাও ওঁকে,
জানো না তুমি কী ভীষণ ভালবাসেন উনি চা,
যেমন ভালোবাসি এখন আমি ভাত
ঝিঙে-পটল-ফেলা মাছের ঝোল দিয়ে।
কুলোবেনা তোমার একটি-দুটি কৃপণ পেয়ালায়,
গলায়-গলায় চাই ভরা-ভর্তি একটি নিটোল কেট্‌লি।'
বললুম, 'আজ নয় অমলা,
ভালো হয়ে ওঠ তাড়াতাড়ি,
কেৎলি ছেড়ে নিরেট একটি জালাই তখন খাবো
তোমার সঙ্গে বসে'।'

মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সি
বস্তির গা ঘেঁসে।
তখনো ঝরে' চলেছে বৃষ্টি
জিনিয়ার বাগানে,
খোলার চালে আর কাঁচা নর্দমার পঙ্কিলতায়।

বৃষ্টি এনেছে অপরিচয়ের কুয়াসা
ধূসর অন্তরাল
পরিমিত প্রাত্যহিকতা থেকে।
এগিয়ে এসে দেখি, ট্যাক্সি-ড্রাইভারের পাশে বসে'
আধো-বয়সের মেয়ে একটি বস্তির।
সায়ন্তন প্রসাধনের থেকে উঠে এসেছে আচমকা
সাজা-না-সাজার আধো-আধো দ্বিধা নিয়ে শরীরে :
যেমন, রঙিন জ্যাকেট এঁটেছে আঁটো-আঁটো বোতামে,
কিন্তু দিনের দাগ-ধরা সাড়িটা হয়নি বদলানো ;
আঁচড়ানো হয়েছে চুল, কিন্তু চিকনিয়ে ওঠেনি বেণী,
পায়ে দিয়েছে আলতা, কিন্তু সিঁথিটা রয়েছে সাদা।
যেন কোন বাঁশিওয়ালা দিয়েছে ডাক
কাজের থেকে সাজের থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই মেয়ে
যেমন ছুরি ছোঁয়ালেই রক্ত আসে বেরিয়ে।
চেয়ে দেখেনি কতটুকু সে নিজে, কতটুকু সে নয়,
বেরিয়ে এসেছে তার বিলজ্জ স্বাভাবিকতায়।

এগিয়ে দেখি, পিছনের সিটে বসেছে পাশাপাশি,
রুমালে-করে'-ধরা কলাই-করা টিনের একটা মগ হাতে ড্রাইভারের
চায়ে-ভতি কানায়-কানায়,
থেকে-থেকে চুমুক দিচ্ছে দু'জনে
সঙ্কুচিত, সুঁচলো ঠোঁটে,
নরম নিরিবিলিতে।
ঝরে' চলেছে বৃষ্টি
আর গড়ে' উঠেছে ধূসর অন্তরাল।

আমাকে দেখেই চমকে উঠলো দুজন
তাদের বিস্রস্ত বিশ্রাম থেকে।
বললুম, 'থাকো তোমরা বসে'
আমিই ধরবো হুইল।'

কাণামাছি

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

একদা আষাঢ়ে এসেছি এখানে
মিলের ধোঁয়ায় প'ড়লো মনে
গলিতে, কি মাঠে কখনো ক্বচিৎ
দেখা দিয়ে যায় দখিন হাওয়া।

দৈবপ্রসাদে কবে সংসার
কচি জনতায় গিয়েছে ভ'রে
সকলে পারিনা বাঁচ্‌তে, আপন
বাঁচার পন্থা কাজেই নেওয়া।

মানে, দৈনিক পরের কিম্বা
নিজের দায়েই শ্মশান চষি
মাটিতে নামাই রঙীন গেলাস
খুঁজি সফলতা তন্দুর শাথে।

মন থেকে মেঘ নিয়েছে বিদায়
সে-উপনিবেশ শরীর নিলো
জটিল স্মৃতির পায়ে পায়ে তবু
হারানো প্রেমের ছায়ারা ঘোরে।

আমি ত্রিশঙ্কু, পথ খুঁজে ফিরি
গোলকধাঁধায় বৃথাই ঘোরা
জানি বাণিজ্যে লক্ষ্মী, তবুও
ছিদ্রিত থলি ওপথে বাধা।

কৃষক, মজুর! তোমরা শরণ,
এছাড়া নেইকো অন্য গতি
যেপথে আস্‌বে লাল প্রত্যূষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে'।

এখানে এসেছি আষাঢ়ে একদা
মিলের ধোঁয়ায় প'ড়লো মনে
কালবৈশাখী নাম্‌বে অধীর
আমাদের হাত-মিলানো গানে॥

বন্দীযন্ত্র

দিনেশ দাস

যন্ত্রের টুঁটি বজ্রমুষ্টিতে তোমরা ধরো
তোমাদের থাবা লৌহ হ'তেও তীক্ষ্ণতর!
আমরা শুনেছি ঘুমমন্থর মধ্যরাতে—
অত্যাচারিত যন্ত্র কাঁদিছে যন্ত্রণাতে।

তোমরা গড়নি যন্ত্র-জগৎ সভ্যতার,
অস্থিসারের অস্থিতে গড়া অস্থি তার:
হায় সে অবুঝ বন্দীযন্ত্র দুর্নিবার
লক্ষ মানুষে যন্ত্র করিছে লক্ষবার।

যন্ত্রের ভারে তোমরা রচেছ অন্ধকারা,
নিযুত নিঃস্বে তোমরা করেছ সর্ব্বহারা,
যন্ত্র এবার আলোয় আসিবে ছন্নছাড়া,
যন্ত্র স্বাধীন! মন্ত্র স্বাধীন আত্মহারা।

আমরা এসেছি, এবার এসেছি সিন্ধুপারে,
অনেক কান্না ঝরিতে দেখেছি বিন্দুধারে,
আমরা এনেছি জীবন-মন্ত্র বন্ধদ্বারে—
বন্দীযন্ত্র রবেনা বন্দী অন্ধকারে!

"নামঞ্জুর"

আশালতা সিংহ

ন'টা প্রায় বাজে, স্বামীর অফিসের সময় হইয়া আসিয়াছে; রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি মাছের ঝোলটা চড়াইয়া দিয়া মন্দাকিনী আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার প্রত্যাশিত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সকালের ডাক আসিবার সময় হইয়াছে, আজও কি কোন চিঠিপত্র আসে নাই! আসিয়া থাকিলে স্বামী তো তাহাকে নিশ্চয়ই দেখাইতে আনিতেন। মন্দাকিনীর এত ব্যস্ততার কারণ ছিল। মাসখানেক হইল তাহার বড়মেয়ে ইন্দুর এক জমিদার বাড়ীতে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে। গতসপ্তাহে পাত্রপক্ষের কাছে ফটো ও ঠিকুজি গেছে। ফটো দেখিয়া তাঁহাদের পছন্দ হইয়াছে কিনা এবং ঠিকুজির মিল হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য মন্দাকিনী অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়া আছে। প্রত্যেকদিন সে অন্ততঃ বিশ বার সকলকে প্রশ্ন করে, আজকের ডাকে কোন চিঠিপত্র এসেছে কিনা জান গো? তুই জানিস নন্দ? জানিস না? তোদের কোন্ কথাটাই বা জানবার ফুরসৎ রয়েচে। যা দেখি একবার চট্ করে' ডাকবাক্সটা খুলে দেখে আয়, যদি পিয়ন ওতেই ফেলে দিয়ে গিয়ে থাকে!

কিন্তু এত ব্যাকুলতা ও ব্যস্ততা সত্ত্বেও কোন চিঠি এ যাবৎ আসে নাই। আজও মন্দাকিনী উৎসুক হইয়া পথপানে চাহিয়া আছে, এমন সময় স্বামী সুধাংশু স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে সেখানে আসিল, তাহার হাতে একটা নীলাভ রঙের পুরু খাম। খামখানা মন্দার হাতে দিয়া কহিল, এই নাও তোমার চিঠির জবাব আজ এসেছে। আসচে শুক্রবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে। দেখে পছন্দ হ'লে তবে অন্য কথা। চিঠি পরে পড়বে, ঢের সময় মিলবে তার। এখন আমাকে তাড়াতাড়ি ভাত দাও, আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

মন্দা তখন রুদ্ধনিঃশ্বাসে চিঠিখানা যেন গিলিতেছিল। একবার পড়িয়া সযত্নে সেখানা তাকের উপর তুলিয়া রাখিয়া কহিল, এই যে ভাঁত বাড়ি। ঝোলটা নামিয়েই দিচ্ছি। ওরা তাহলে মেয়ে দেখতে আসচে। এই সাত আট দিন চিঠির কোন জবাব না পেয়ে আমি তো আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলুম।

সুধাংশু অফিসের লেট্ হইবার ভয়ে উবুজলন্ত ভাত কোনক্রমে গলধঃকরণ করিয়া জামার বোতাম আঁটিতে আঁটিতে ছুটিল। অন্য দিকে চাহিবার বা অন্য কথা আলোচনা করিবার সময় তাহার ছিল না।

স্বামী অফিস চলিয়া যাইবার পর বড় ছেলেকে কলেজে ও বাকী ছেলেদের স্কুলে রওয়ানা করিয়া দিয়া মন্দা এতক্ষণে একটু নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাইল। তাকের উপর হইতে চিঠিখানা আর একবার পাড়িয়া ধীরে সুস্থে পড়িতে বসিল। পাত্রপক্ষ লিখিয়াছেন, ফটো দেখিয়া মন্দ লাগে নাই, কিন্তু নিজের চোখে আর একবার যাচাই করিয়া না দেখা অবধি তাঁহারা কিছুই

বলিতে পারেন না। সামনের শুক্রবারে সকালের ট্রেণে তাঁহারা আসিয়া মেয়ে দেখিয়া যাইবেন। কয়েক ছত্রের ছোট চিঠিখানি মন্দা অপূর্ব্ব মমতাভরে বার বার করিয়া পড়িল, তাহার পর মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিল : হে ঠাকুর, দেখো এই ক'রো দেখে যেন তাদের পছন্দ হয়। এইখানেই যেন হয়ে যায় ঠাকুর। ইন্দুর সেদিন স্কুলের বাস থার্ড-টীপ্ বলিয়া একটু দেরীতে আসিবে। এতক্ষণে সে স্নান সারিয়া রান্নাঘরে আহারের জন্য আসিল। মাকে বিমনার মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, মা ভাত দেবেনা? স্কুলের গাড়ী আসবার সময় হয়ে এসেছে কিন্তু।

মা চমকিয়া মেয়ের দিকে চাহিলেন। কে বলে মেয়ে তাঁহার দেখিতে মন্দ। এমন সুন্দর চুল এমন নাক চোখ মুখের গড়ন হাজারে একটা মেলে।

মা বলিলেন মৃদু মিনতির স্বরে, স্কুলের বাস এলে ফিরিয়ে দিও ইন্দু; এখন এই কয়েক দিন তোমার আর স্কুল যেতে হবে না।

ইন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন মা?

মন্দাকিনী আপত্তির ভঙ্গীতে কহিলেন, না, এখন আর যাবার দরকার কি? সেই তাড়াতাড়ি দু'টি ভাত নাকে-মুখে গুঁজে ধুলোতে রোদে প'াচটা অবধি বাইরে থাকতে হবে না। মুখ চোখ বসে' যাবে, বিশ্রী দেখাবে।

ইন্দু বেচারা অবাক হইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এতদিন নয়টা-প'াচটা স্কুল করিয়া তাঁহার কিছুই হয় নাই, আজই হঠাৎ তাহার স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া মা কেন যে এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন মনে মনে তাহার কারণ হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মন্দাকিনীর ছোটবা রমাসুন্দরী খোকার জন্য দুধ গরম করিতে দুধের বাটি হাতে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

দিদি চিঠি এলো বুঝি?

হ্যাঁ, ভাই। শুক্রবারে তারা আসবে মেয়ে দেখতে।

রমা দুধের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া উপদেশের ভঙ্গীতে কহিল, ইন্দুকে আর ইস্কুলে পাঠিওনা। এর আগেই তোমার ইস্কুল বন্ধ করা উচিত ছিল দিদি। প'াচটার সময় তেতে-পুড়ে মেয়ে যখন বাস থেকে নামে তখন তাকে আর দেখে চেনাই যায় না যেন। চোখ মুখ শুকিয়ে যায়। এমন ধারা করলে কি আর মেয়ে পছন্দ হবে? তার উপর ফটো যত সুন্দরই উঠুক ইন্দুর রঙের তেমন জৌলুষ নেই। এখনকার দিনে আবার রঙই যথাসর্ব্বস্ব। গোরা সর্ব্বদোষ হরা···ঐ যে কথায় বলে।

মন্দা চিন্তিত মুখে কহিল, তাই তো ভাবচি ভাই। কি করি তার কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। আজ থেকে তো স্কুল যেতে বারণ করলুম। এটা আগে মনে হয়নি। রমাসুন্দরী খোকাকে দুধ খাওয়াইবার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া একাধারে আশা এবং ভরসা দিয়া কহিল, ভয় কি দিদি, এখনও তো একহপ্তা সময় আছে, ইন্দুকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে দেখ কতদূর কি করতে পারি। তোমরা মানো কি না মানো জানিনে কিন্তু ঘসা মাজায় যে কতটা হয় চোখের সামনে প্রমাণ দেখলে অবাক লাগে। মিত্তিরদের নমিতাকে দেখলে না? বিয়ের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হতেই মেয়ের যেন নতুন রূপ

হ'লো। আগাগোড়া কে যেন ভেঙে গড়েছে। গোটাপ'াচেক টাকা দিয়ে মণিকে একবার বাজার পাঠাও দিকি। আমি ফর্দ্দ করে' দিচ্ছি, সেই মত সমস্ত জিনিষটি যেন খুঁটিয়ে আনে। মণি ইন্দুর বড় দাদা। সে কলেজ হইতে আসিয়াই কাকীমার ফর্দ্দমত নানা প্রসাধনের দ্রব্য-সামগ্রী কিনিতে বাজারে ছুটিল।

পরের দিন হইতে কাকীমার তত্ত্বাবধানে ইন্দুর দিনযাপন দুরূহ হইতে দুরূহতম হইয়া উঠিতে লাগিল ক্রমশঃ। সকাল হইতে উঠিয়া তাহাকে এত রকম বস্তু মাখিতে হয়, এতবার স্নান করিতে হয় এবং উঠিতে বসিতে তাহার কালো রংয়ের জন্য এতবার আক্ষেপোক্তি শুনিতে হয় যে, তাহার মন বিরস বিকল হইয়া গেছে। বিধাতা যদি দৈবাৎ তাহাকে গৌরাঙ্গী করিতেন তাহা হইলে অনায়াসে হেলাভরে সে কোন ধনীগৃহের বধূ হইয়া দামী শাড়ী এবং হালফ্যাসানের অলঙ্কার পরিয়া মোটরে চড়িয়া এবারকার মত এ নারীজন্ম সফল করিয়া তুলিতে পারিত কিন্তু তা যখন করেন নাই তখন কতদূর কি হইবে বলা যায় না। ইন্দুর মা সবারই ভাগ কমাইয়া মেয়েকে তিনচার বার করিয়া দুধ দিতে লাগিলেন। যাহা কখন হয় নাই তাহাই সম্ভব হইল, বিকালবেলায় আনারস, বেদানা, আঙুর, মাখন তাহার জন্য বরাদ্দ হইল। যেন কি একটা আসন্ন মহাসমরের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তোলা হইতেছে। মেয়েটা কিন্তু এত যত্নেও ভিতরে ভিতরে শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিতেছে। কি যেন এক মহালজ্জায় সে বিবর্ণ। তাহার মনে হইতেছে, ফাঁকি দিয়া একটা পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণ সে গ্রহণ করিতেছে, ইহার পর জমাখরচের পাতায় দেউলিয়া হইবার হিসাবটা যখন ধরা পড়িবে তখন লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিবে না। পাত্রপক্ষকে লিখিয়া আরও মাসখানেকের সময় লওয়া হইয়াছে। ইন্দুর কাকীমা আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, এতটা সময় যখন হাতে পাইয়াছেন তখন আর ভাবনা নাই। যেমন করিয়া হোক, ঘষামাজার ফলে ইন্দুকে তিনি দাঁড় করাইবেন। শ্রাবণের প্রথমের দিকেই বোধ করি সেটা সাত কিংবা আট তারিখ হইবে, ইন্দু ঘরে বসিয়া একটা বই পড়িতেছিল, বইখানা সামান্য হইলেও তাহার মনের কল্পনার রঙে রাঙিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় বহির্দ্বারে একখানা মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। ইন্দুর কাকীমা উঠি কি পড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ওলো ইন্দু বই রাখ্। শীগ্‌গির চল্ গাটা ধুয়ে ফেলবি। ওরা এসে পড়লো যে!

ইন্দু সাধ্বস শঙ্কিত চিত্তে উঠিল। তাহার মনেও একটা আবেগের কম্পন উঠিল। আকাশে নূতন মেঘের ঘনিমা, বাতাসে সজল বায়ুর স্নিগ্ধতা, ইহারই সহিত মিলাইয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট আবেগে এবং মধুরতায় তাহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, বহু বহুদিন হইতে সে যাহার প্রতীক্ষায় ছিল আজ তাহারই রথচক্রের ধ্বনি শোনা যাইতেছে। অনাগত উদার ভবিষ্যতে বহু সম্মানে সে তাহাকেই জীবনের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বরণ করিয়া লইবে।

একে একে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া জুটিতে লাগিল। হাল্কা রংয়ের সিল্কের শাড়ি, জর্জ্জেটের শাড়ি, ঢাকাই শাড়ি, মুর্শিদাবাদি শাড়ি একরাশ আসিয়া জড়ো হইল। কানবালা, আর্মলেট, আংটি, মুক্তার হার সে সবেরও অসদ্ভাব হইলনা পাড়ার মেয়েদের কল্যাণে। মিত্তিরদের বাড়ীর

দুই বধূই সম্ভ্রান্তবিবাহিতা আধুনিকা ধনীকন্যা। তাহারা যাহা প্রয়োজন অলঙ্কার আনিয়া দিল। সাজাইবার সময় এটা-ওটা পরামর্শও দিল।···চুলটা আর একটু নামিয়ে দাও না ভাই।... সিঁদুরের টিপের বদলে ষ্টার প্যাটার্নের ঐ সোনালি টিপটা দাও। সিঁথি আজকাল কেউ পরে না। গলায় একরাশ নেকলেস, কণ্ঠি পরানোর চেয়ে মুক্তোর কাজকরা লকেট দেওয়া ঐ ছোট হারটা দাও। বৈঠকখানায় বসিয়া পাত্র এবং পাত্রের দুই বন্ধু তখন সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত উচ্চাঙ্গের রাজনীতি আলোচনা করিতেছিলেন। চায়ের পেয়ালার ঈষৎ ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ এবং দামী সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝে তাঁহাদের মৃদু হাস্যধ্বনি মিশিতেছিল।

ছেলের বাবার আসিবার কথা ছিল কিন্তু আজকালকার ছেলেরা নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করা অধিকতর পছন্দ করে বলিয়া তিনি বন্ধুদের সঙ্গে ছেলেকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিজে আর আসেন নাই।

গল্প করিতে করিতে বরের বন্ধুরা পানের খিলি হইতে লবঙ্গটি খুলিয়া মুখে দিয়া ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিল। ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, মেয়ে আনিতে তাই আর দেরী হইল না। ইন্দু তাহার কাকার সহিত সলজ্জজড়িত চরণে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই আশা করিয়াছিল, গান বাজনা লেখাপড়া প্রভৃতির প্রশ্ন উঠিবে। এবং এজন্য মেয়েকে বহুবার বহু কথা শেখানো হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গুটিকতক কবিতা তাহাকে কণ্ঠস্থ করানো হইয়াছিল। একখানি খাতায় বহু যত্নে ইংরাজী ও বাংলা হাতের লেখা নমুনা স্বরূপ লেখানো হইয়াছিল। একমাস ধরিয়া এস্রাজে একটি গৎ প্রতিদিন বাজাইয়া সে অভ্যাস করিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটি আসিয়া নতমস্তকে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল নাম কি জিজ্ঞাসা করা ছাড়া আর কেহ তাহাকে কোন প্রশ্ন করিল না। বরক্ষ যুবকদলের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। একজন হাত ঘড়িটার পানে চাহিয়া বলিল, এবার তাহলে আমরা উঠি। ট্রেণের আর বড় বিলম্ব নেই। যা হয় পরে যেয়ে জানাব।

তাহাদের ভাবভঙ্গীতেই স্পষ্ট বোঝা গেল মেয়ে পছন্দ হয় নাই। কোনক্রমে যাইতে পারিলেই তাহারা বাঁচে। চা ও জলখাবারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ঠেকানো গেল না বটে। কিন্তু যথাসম্ভব নীরবে তাহারা তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিল। পাশের ঘরে মন্দাকিনী রুদ্ধনিঃশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফাঁসির হুকুম শুনিবার আগের মুহূর্ত্তেও কয়েদী যেমন আশা ছাড়িয়া ছাড়েনা সেও তেমনি করিয়া মজ্জমান আশাটাকে প্রবলভাবে আঁকড়াইয়া ধরিল। কে জানে হয়তো উহাদের দেখিয়াই পছন্দ হইয়াছে বলিয়া আর কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিল না। তাহার কানের কাছে ছোটখা পাশের বাড়ীর মেয়েদের ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছিল, উঁহু, কালো রং আজকাল কোন ছেলেরই পছন্দ হয় না দেখচি। গড়ন, নাক মুখ চোখ যেমনই হোক রংটা ফর্সা চাই। এত চেষ্টা করা গেল কিন্তু শুধু ঘষা মাজায় কি আর গৌরবর্ণ হয়। পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী সহানুভূতি করিয়া কহিল, যা বলেচ ভাই, আজকালকার ছেলেগুলোর যেন রং রং কী এক বাতিক হয়েচে। শেষে রেডিওতেও কাল শুনছি রূপচর্চ্চার বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। কি করে' তাড়াতাড়ি রং ফর্সা হয়। কতরকম ব্যাখ্যা করেই না বলচে।

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

পাত্র এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা হুড়মুড় করিয়া ঝটিকাবেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যাহা অস্পষ্ট ছিল তাহা সুস্পষ্ট হইতে আর বড় দেরী হইল না। মা অধোমুখে বিবর্ণ হইয়া রহিলেন। পিতা কহিলেন, আমি তো আগেই বলেছিলুম বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যেও না। তোমার যে আবার আশারও অন্ত নেই, সখেরও অন্ত নেই। জমিদার, বড়লোকের ছেলে ও সব সখে কাজ কি আমাদের বাপু! যখন মেয়েই কালো।

ইন্দু তাহার অনাদৃত সাজসজ্জা লইয়া একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কাপড়টা অবধি তাহার ছাড়া হয় নাই। মা আসিয়া তিক্তস্বরে কহিলেন, নাও, কাপড় চোপড়গুলো খুলে ফেল দিকি। যাদের যা তাদের সব হিসেব করে' ফিরিয়ে দিই। কিছু হারিয়ে না যায়।

রাত্রি বেলায় শয়ন-কক্ষে পিতা ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, শুনলুম ইন্দু আর স্কুল যায় না? ওর স্কুল বন্ধ করেছ না কি? না তা কোরোনা। যা মেয়ের রং, বিয়ে হবে কি না তারই স্থিরতা নেই। তার উপর লেখাপড়া যেটুকু শিখচে তার থেকে বঞ্চিত কোরোনা। ভবিষ্যতে করে' খেতে পারবে। আমি কালই আবার স্কুলে চিঠি দিয়ে দেব।

সারারাত্রি ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। ভোর হইতে ইন্দু আবার তাহার যথানিয়মিত কাজে ভর্ত্তি হইল। স্বস্তি পাইল অনেকটা সে। আর কেহ তাহাকে দুধের বাটি লইয়া খাইতে সাধিলনা, ফলের রেকাবি সাজাইয়া সুমুখে ধরিলনা। ন'টা বাজিবামাত্র তাড়াতড়ি স্নানাহার সারিয়া একখানা আধময়লা মোটা সাদা শাড়ি পরিয়া স্কুলের বাসে চাপিয়া বসিল। বাসে আরও সহপাঠিনী মেয়েরা ছিল, তাহারা বলিতে লগিল.....ইন্দু একমাস স্কুল কামাই করাতে তোমার উপর অনিমাদি যা চটেছেন ভাই। আমাদের এর মধ্যে একশো বাহাত্তর উদাহরণ মালা অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে। জিওমেট্রি পনেরোটা থিওরম আরও বেশি পড়ানো হয়েছে। ক্লাসে আজ তোমার খুব অসুবিধে হবে। কিছুই ধরতে পারবে না।

সকাল বেলাকার খর রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গেছে। সেইদিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া ইন্দু মৃদুস্বরে কহিল, যেগুলো পিছিয়ে গেছি, বেশি করে' খেটে আবার সেগুলো করে' নেব। অনিমাদিকে একটু বুঝিয়ে ব'লো ভাই যেন রাগ না করেন।

আধুনিকতা, গান্ধীত্ব ও গান্ধীবাদ

যামিনীকান্ত সেন

ভারতবর্ষের সমস্তা দিন দিন গুরুতর হয়ে উঠ্‌ছে। এ যুগে ভারতবর্ষ সর্ব্বহারা হয়েছে। ইংরাজ শাসনে প্রবল প্রতীচ্য সংস্পর্শ এর গণ্ডার চর্ম্মের উপর স্থায়ী কাজ করতে পারে নি। চোখের উপর জাপানের ও তুর্কীর উত্থান দেখা গেল। সকল রকম অলীক সঙ্কোচ ও লঘু অহমিকা ত্যাগ করে' এ দু'টি দেশ নূতন যুগের ভাবগত ও ব্যবহারগত আদর্শ গ্রহণ করেছে এবং তাতে অধুষ্য হ'য়ে উঠেছে। জাপানের ঐশ্বর্য্য ফলিত হয়েছে প্রতিগৃহের আনন্দ কলরবের ভিতর। জাপানে দুর্ভিক্ষ নেই—হাহাকার নেই। জাপান Loincloth philosophy মানে না।

অপরদিকে দেখতে হবে, ভারতে এখনও একটা আলপিন বা সূঁচ তৈরী হয় না। অষ্টপ্রহর অনাহার ও অনিদ্রার ক্রন্দন, সংক্রামক রোগের পৈশাচিক লীলা এখানে ত চল্‌ছেই। অথচ বলা হচ্ছে যন্ত্রযুগের যন্ত্রের সাহায্য বর্জ্জন করে' হাতে-কাটা চরকার সাহায্যে এসব দুঃসহ ব্যাপারের অবসান করা হবে। শুনতে ভাল—কারণ এ দেশ ভাবে রামরাজ্য বা সোনার যুগ ছিল অতীতে এবং সে-যুগ সমৃদ্ধ হয়েছিল চরকা ও গরুরগাড়ীর সাহায্যে। কাজেই চরকা ও গরুরগাড়ীর জয়গান করতে হবে। সকল কাল ও দেশের একটা আবেষ্টন ও আবহাওয়া আছে—একটা economic setting আছে; প্রাচীন যুগের settingকে এ যুগে খাপখাওয়াবার চেষ্টা যে একটা বাতুলতা এটা বোঝবার মোটা ক্ষমতাও গুজরাটের পরিচালিত ভারতবর্ষ হারিয়েছে। এমনি করে' একটা নূতন বর্ব্বর যুগ ভারতবর্ষে এসেছে।

বর্ব্বর যুগ মোটা কাপড়, মোটা চাল ও মোটা আসবাব ভালবাসত। এদেশে এটার প্রতি টানের মূলে আছে দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য স্বীকৃতি। এদেশের প্রাচীন কথা আছে:

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।"

যারা নেংটি পরে তারাই সৌভাগ্যবান। ভিক্ষাবৃত্তিও এদেশে সম্মান লাভ করে। দলে দলে গেরুয়া পরে' ভিক্ষা করাতে এদেশে অপমান নেই। কাজেই দারিদ্র্যের শিরে যখন জয়মুকুট দেওয়া এদেশে সম্ভব হয়েছে তখন দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ত এদেশে চিরস্থায়ী হবেই। যারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত নয় তারাও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত ভাণ না করলে এদেশে নেতৃত্ব চল্‌বে না। এদেশের নেতারা ক্ষমতা থাকলেও রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘোরেন। এটাকে ভণ্ডামি বলা হয় না। মায়াবাদ, সন্ন্যাসবাদ প্রভৃতি আধুনিক যুগে বিস্তৃতিই লাভ করেছে। কাজেই ভারতের রাষ্ট্রীয় নেতাকে সাজতে হয়েছে ফকির! বর্ত্তমান নেতা গান্ধীজী এরকমের অভিনয়ে অদ্বিতীয় কৃতিত্ব লাভ করেছেন।

গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হ'তে ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁর কোট প্যাণ্ট ছিল। সে সব আমরা দেখেছি। যখন মতিহারীতে নীলকরদের জন্য জেলে যাওয়ার উদ্যোগ করেন তখনও তিনি এখানকার খেলার রংয়ের তাস চেনেন নি। তখন তিনি ছিলেন মিঃ গান্ধী। তাঁকে

ভাস্করানন্দ স্বামী বলে' কেউ ভ্রম করেনি। কিন্তু তিনি ক্রমে এখানকার তাল বুঝতে পারলেন। নেহাৎ স্ত্রী আছে বলে' গেরুয়া পরা সম্ভব হয়নি—তা ছাড়া সব-কিছু কাণ্ডই করে' বস্‌লেন। একটা আশ্রম হ'ল—শিষ্য ও শিষ্যা হ'ল অনেক। একটা দস্তুরমত বশিষ্ঠ ঋষি হওয়ার উদ্যোগপর্ব্ব চল্‌তে লাগল। কাপড়ের পরিবর্ত্তে loin cloth হ'ল এবং হাতে যষ্টি হ'ল, এমন কি বিস্ময়ের বিষয় তিনি উপাসনাও চালাতে লাগলেন। কেশব সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির কৃত্য এসব তোড়জোড়ের নিকট সহজেই হতশ্রী হয়ে গেল। কেশব সেন loin cloth পরেন নি—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও অতটা দৌড় দিতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোগা-চাপকানকে হতশ্রী করে' এই গুজরাটী নেতা হাট কোট ছেড়ে একেবারে লজ্জাবস্ত্র মাত্র গ্রহণ করলেন। আধুনিক ভারতের রঙ্গমঞ্চে এ রকমের quick change আর্টিষ্ট আর দেখা যায়নি। এমনি করে' আধ্যাত্মিক পোষাক গ্রহণের high jumpএ গান্ধীজী ভারতে record স্থাপন করেছেন। শোনা যায় সমগ্র পৃথিবীতে record স্থাপন করতে উদ্গ্রীব হ'য়ে তিনি একটি ছাগমাতা পুষে' ছাগদুগ্ধ পানের অভিনয়েও V. C. পেয়েছেন। অপর দিকে সন্ন্যাসের রেসে তিনি ভাস্করানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণপরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতিকেও হার মানিয়েছেন long distant উপবাসের (fast) ভেল্‌কি দেখিয়ে। এ রকম fastএর কথা এক সময় প্রতিদিন খবর কাগজে তারের সাহায্যে বড় অক্ষরে ছাপান হ'ত! আবার কি? তিনি এক নিঃশ্বাসে হয়ে পড়েন "Prophet" বা অবতার! এর পরে হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী সহরগুলিতে গান্ধীজীর চেহারাকে রুফের মত এঁকে কাগজে ছাপিয়ে বিক্রী করা হ'ত। তারপর গান্ধীজীও Prophetএর মত message জারি করতে লাগলেন। এসব messageএর ভিতর একবার একটা বড় কথা বলে' বসেন, সেটা হ'ল যে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করবে। সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতর এত বড় অসার ও অলীক কথা বলেও তাঁর তক্‌মাতাবিজের খাতিরে গদীচ্যুতি ঘটেনি।

মোটা কাপড়, গরুর গাড়ীর মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রেল ও মোটর গাড়ী বর্জ্জনের উৎসাহও উপস্থিত করা হ'ল। শ্রীচৈতন্যের মত পদব্রজে উড়িষ্যার খানিকটা ভ্রমণের অভিনয়ও ভারতের মঞ্চে প্রতিভাত হ'ল। লৌহযুগসুলভী শিষ্যের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। ওয়ার্দ্ধার চক্র বিজ্ঞানকে শূলে চড়িয়ে চারিদিকে মুক্তভাবে প্রেতনৃত্য সুরু করল।

অপরদিকে জাপানের ইতিহাসে দেখা গেল বিপরীত অধ্যায়। ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি প্রচলনের পূর্ব্বেই একসময় অতিবিজ্ঞ উপনিষদের উপদেশকরা বলতে সুরু করেছিলেন যন্ত্রদানবের কথা। দানব আসবার আগেই এঁদের কল্পনা দানবের 'অত্যাচার'কে প্রত্যক্ষ করে—কাজেই সে দানবকে আমরা আমাদের অনুকূলে আনতে পারিনি। পরে তা' আমাদের ঘাড়ে চেপে রক্তশোষণ সুরু করেছিল। জাপান যন্ত্রকে পোষ মানিয়েছে। জাপানের যন্ত্রপ্রাচুর্য্য হয়েছে Chrysanthemum-এর বাগানের মত! অসংখ্য পরিবারের শিশু, বালক ও বালিকা আচ্ছন্ন করেছে এসব যন্ত্রকে—যেন এসব কল্পবৃক্ষ! বস্তুতঃ ইউরোপের ভিতরকার ঘাত-প্রতিঘাত যন্ত্রের সৃষ্টি নয়! ও রকমের ঘাত-প্রতিঘাত তত্ত্বপূর্ণ সমাজের ভিতরই যন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যেখানকার সমাজ

পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ সেখানে যন্ত্র কিছু করতে পারে না। কাজেই জাপান কোনরকম ন্যাকামি না করে' এবং কোন মহান সত্য ও উপলব্ধিকে অস্বীকার না করে' এই কল্পবৃক্ষের সহায়তা যাচ্ঞা করে এবং তাতে অভীষ্ট লাভ করছে। নব্য-তুর্কীও ইদানীং নিজের ইতিহাসে বিজ্ঞানবাদ শিরোধার্য্য করে' অগ্রসর হয়েছে।

আঙ্গুর ফল তেতো যে বলে, সে তার দুর্ব্বলতাকে দুর্ব্যাখ্যা দিয়ে ঢাকতে চায়নি। তাছাড়া inferiority complexএর লক্ষণই হচ্ছে চাক্ষুষ বিরাট সত্যকে স্বীকার করার অক্ষমতা। সমগ্র দুনিয়া যে আধুনিক আবিষ্কারের প্রভাবে আন্দোলিত—অহরহ যে সমস্তের প্রসাদ সমগ্র মানবজাতি ভোগ করছে সে সব তপস্যার ফল! রুদ্রযোগ আছে ওদের পশ্চাতে এবং এ-যোগের পশ্চাতে আছে তুরীয় আশীর্ব্বাদ ও স্বীকৃতি। তুরীয় বিধির একটি বিন্দু লঙ্ঘন করেও এসব শক্তিলীলা প্রকটিত হচ্ছে না। জাপান বা ইউরোপের জনতাও উপনিষদের "অমৃতের সন্তান"। উপনিষদের উক্তিকে অধ্যয়ন করতে হবে জগতের লীলায়—আধুনিক ভারতীয় অভিনেতাদের ভিক্ষার ঝুলিতে নয়! পয়ঃপ্রণালীতে পতিত ও কর্দ্দমাক্ত ভারত উপনিষদের আনন্দবাদ উপলব্ধির অধিকারী নয়—যতই নানা আশ্রমের খাঁচা হ'তে চেঁচামিচি করা যাক্ না কেন। ফলে আজ ভারতবর্ষ হয়ে পড়েছে একঘরে'। "Abyssinia", "Czechoslovakia" ও অধঃপতিত Chinaর সঙ্গে মিতালি করতে গ্রীবা বের করা ছাড়া গুজরাট-প্রভাবিত ভারতবর্ষের গত্যন্তর নেই। জাপানের সঙ্গে করমর্দ্দন করার সাহস ও শক্তি কি ওয়ার্দাচক্রের আছে?

গান্ধীত্বের এই সমস্ত 'Outfit' ছাড়া আরও কিছু উপকরণ আছে। তত্ত্বের দিক হ'তে সে সব আলোচনা প্রয়োজন যদিও গান্ধীত্বের সংহতিপূর্ণ তত্ত্ব অতি সামান্য। এর ভিতর 'Fast', 'Non co-operation' ও 'Non-violence' উল্লেখযোগ্য। কারও বাড়ীতে ধন্না দিয়ে টাকা বা আহার্য্য আদায় করা fastএর দ্বারা সম্ভব হয়। এ রকমের underhand ব্যাপার কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির বা জাতির অবলম্বনের যোগ্য কি? "আমাকে এ জিনিষটা না দিলে না খেয়ে মরব!" এ রকমের ভীতি-প্রদর্শনের মূলে আছে প্রতিপক্ষের উপর সীমাহীন বিশ্বাস এবং অসংভাবে দান লাভ করার মনোবৃত্তি। Beggingএর দ্বারা রাষ্ট্রাধিকার লাভ সম্ভব হয় না। গান্ধীজী এ অস্ত্রের দ্বারা অনেক কাণ্ড করেছেন। দুর্ব্বল ভারতবর্ষে সত্যের উপর কঠিন আস্থা নেই—হিমাদ্রির মত নিঃশব্দে সত্যকে শীর্ষে ধারণ করতে ভারত ভুলে গেছে। কাজেই পান থেকে চুন খসলে কান্নাকাটি ওঠে। কেউ মরে' গেলে পাড়াশুদ্ধ এসে জড়ো হয়ে কাঁদে—দু'জনে মারামারি হ'লে দশজন এসে মিটমাট করে' দেয় পাছে কারও আঁচড় লাগে। অধীনতা, মানসিক দৈন্য, দাসবৃত্তির দ্বারাই এসব সম্ভব হয়। কাজেই গান্ধীজী মরবার অভিনয় করলে দুর্ব্বল স্বাস্থ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত ছুটে যান কাকুতি মিনতি করে' তাঁকে বাঁচাতে। এমনি হচ্ছে Pityর গমক! এ সমস্ত ন্যাকামির সাহায্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে যাদের বিশ্বাস সমগ্র জগৎ তাদের বর্জ্জন করে' দূর হ'তে সরে' পড়ে।

Passive resistance ও Non co-operation এক রকমের জিনিষ। এটা হ'ল গান্ধীজীর একমাত্র বড়ি যাতে করে' বার বার গরু হারালেও পাওয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে হারানো গরুটি এমনি করে' একবার পাওয়া গিয়েছিলো আবার না কি তা' হারিয়ে গেছে। এখানকার পাওয়া শাসনতন্ত্রের বাছুরটিও গত কয়দিনে হারিয়ে গেছে। তাহ'লে এটা কি পাওয়া হ'ল?

বাঙলা দেশে এক সময় Passive resistanceএর পরীক্ষা হয়। তখন নব্য গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্নপ্রাশন হয়নি। এ চেষ্টার পেছনে বড় বড় আধ্যাত্মিক বুলি ছিল না—এজন্য একে স্পষ্টভাবে Boycott Movementও বলা হয়। তা'তে কেল্লা কতকটা ফতে হয়—কিন্তু কেল্লার শির উড়ে যায়! কারণ রাজধানী সরানো হয় দিল্লীতে। এটি ছাড়া Constitutional agitationএর আর অন্য চরমমূর্ত্তি হ'তে পারে না। সে যাক্, এ movement ঠিক প্রেমের মনে হয় না।

অথচ গান্ধীজীর Non co-operationএর ভিত্তি নাকি প্রেমের উপর। নূনের গোলা আক্রমণের মূলে ছিল নাকি ইংরেজজাতির প্রতি প্রেম। অতিসাবধানতা ও সংস্কারবিহীনভাবে এ সবের আলোচনা প্রয়োজন। এর পরে বলা হয়েছে, বাপ যদি ছেলেকে গালে চড় মারে সেটা হ'ল প্রেমের দান কিম্বা ছেলে যদি বাড়ী ছেড়ে পালায় সেটাও হ'ল প্রেমের কীর্ত্তি। কারণ এ রকমের ব্যবহারে প্রেমের পরীক্ষা হয়। Slave mentality একথা বল্‌তে অস্বীকার করে যে এটাও একটা সংগ্রাম, এমন কি রক্তাক্ত সংগ্রাম অপেক্ষাও এটা অধিক সাংঘাতিক ও ইতর। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে "hitting below the belt"—কোন বীরজাতি এরূপ কাজ করবে না। এ রকমের আক্রমণ অধিক subtle ও গুপ্ত। লখীন্দরের লৌহভবনে সাপ ঢোকার মত এটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমগ্র ভিতরকার বন্ধন শিথিল করে। এটা নেতিমূলক (antithetic) চেষ্টা—সংগ্রাম মাত্রই নেতিমূলক। একে "Non-violent" বলে' বাড়িয়ে তোলা কোন কাজের নয়। এটাও violent. Non-violent শব্দের মানে কি? ধীরে ধীরে বিষপ্রয়োগ কি non-violent ব্যাপার? মোট কথা non co-operationএর নেতিমূলক সঙ্ঘর্ষ প্রেমের ব্যাপার নয়। প্রেম হ'ল অন্বয়ী বা Synthetic ব্যাপার—তার উপাদান ও পন্থা হচ্ছে surrender বা আত্মসমর্পন—সঙ্ঘাত নয়। যুদ্ধ হচ্ছে ব্যতিরেকী বা antithetic ব্যাপার।—তার উপাদান হচ্ছে অস্বীকার, বাধা ও আঘাত। এ সব শুধু দেহস্তরে মাত্র লীলায়িত হয় না। মানসিক ও তুরীয় আঘাত অনেক সময় দেহের আঘাত অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হয়। কাজেই গান্ধীজীর এই বিধান ও তত্ত্ব প্রেমের সৃষ্টি নয়।

Non-violenceএর সাহায্য নিতে হয়েছে violence প্রয়োগের ক্ষমতার অভাব থেকে, কারণ Violence প্রয়োগ করলে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা। ভারতের এই দুর্ব্বলতাকে যথার্থভাবে স্বীকার করাই প্রশস্ত ও বিরাট হৃদয়ের কাজ। অথচ এই ছুতো নিয়ে একটা কৃত্রিম ব্যাপার ঘটিয়ে তোলা হয়েছে। বুদ্ধদেবের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ও খ্রীষ্টের এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দেওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে' তুলনা করে' বলা হয়েছে এরকম্ ব্যাপার গান্ধীজীর একটি মস্ত কীর্ত্তি—কারণ ভারতবর্ষের লক্ষ্যই ছিল অহিংসা। বলা বাহুল্য, ব্যবহার ও তত্ত্বের দিক হতে খ্রীষ্টানগণ এবিষয়ে খ্রীষ্টকে এবং বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে অনুসরণ করে না। মার চেয়ে মাসীমার দরদ বেশী হলেই মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটি এক অলীক কল্পনা মাত্র। বলা হয়েছে অনেক সময়

দেহকে আঘাত অপেক্ষা মনকে আঘাত করা অধিক সাংঘাতিক, গর্হিত ও অমার্জ্জনীয়। জার্ম্মানীর ইহুদী তাড়ানো কি পোল্যাণ্ড আক্রমণ অপেক্ষা অধিক জঘন্য ব্যাপার নয়—মানবিকতার দিক হতে? এ সবের মাঝখানে কোথাও দাঁড়িটানা সম্ভব নয়—তত্ত্বের দিক হ'তে দু'টিরই তুল্যমূল্য। ইতিহাসে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা শ্রীচৈতন্য দলবদ্ধ হ'য়ে non-violent ভাবে কি কখনও নূন ও চিনির গোলা আক্রমণ করেছেন? এসব দিক থেকে গুজরাটী সাধু আরও এক ধাপ উপরে উঠেছেন।

মধ্যযুগের এ সব মতবাদ এত লঘু ও সামান্য যে যথার্থ ভাবুকেরা এ সব শুনে অবাক্ হন। H. G. Wells ভারতবর্ষে এসে এই মতবাদ শুনে' বলেন, এ রকম ব্যাপার শুধু vegotable lifeএই সম্ভব হয়। বস্তুতঃ ইউরোপ মনে করে, সমগ্র evolutionই হিংস্র struggle ও সংগ্রামের দ্বারা পরিচালিত এবং survival of the fittest হ'ল এর পরিণাম। অবশ্য ভারতবর্ষও এরকম একদেশদর্শী-তত্ত্ব মানেনি। কিন্তু গীতায় বা তন্ত্রে দেহকে কোথাও বাড়িয়ে তোলা হয়নি এবং মনকে আঘাত করা অপেক্ষা দেহকে আঘাত করা অধিক পাপের ব্যাপার একথা কোথাও নেই। বরং অনেক সময় দেহকে তুচ্ছ জীর্ণবাস বলে' প্রমাণিত করতে উৎসাহিত হয়েছেন।

এরূপ অবস্থায় অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের গান্ধীস্তব পাঠ করে' মনে হয় ভারতের সমগ্র চিন্তার ধারা কি গুজরাট-প্রভাবিত neolithic প্রেরণায় প্রস্তরীভূত হয়ে গেল? হিংসা ও অহিংসা দু'টি একটি সত্যের যুগ্মরূপ। যিনি অহিংসার ভাণ করেন তাঁর মনে অহরহ হিংসার ভাব জাগ্রত—কারণ হিংসা কি এ-ধারণা না থাকলে অহিংসাবিষয়ক ধারণাই হয় না। এটাই হ'ল হেগেলের dialectics এবং আমাদের তটস্থ বিচারের ব্যবস্থা। তাছাড়া জীবনমৃত্যুর সীমাহীন ধারার ভিতর অনিবার্য্য দেহমৃত্যু ঘটাচ্ছেন বিশ্ববিধাতা। তাহ'লে কি সমগ্র জগৎ-পরম্পরা একটা নিষ্ঠুর বিধান? গান্ধীজীর messageএর দ্বারা কি এ-বিধানের বা Cosmic processএর পরিবর্ত্তন ঘটবে? বিশ্ববিধাতাকেও সিগাঁওয়ের (Segaon) বণিকের নিকট অপরাধী বলে' করজোড়ে দাঁড়াতে হবে? বস্তুতঃ এরূপ অদ্ভুত মতবাদকে এক মুহূর্ত্তের জন্য গুরুভাবে গ্রহণ করা কি সম্ভব? জাগতিক তত্ত্বের দিক হ'তে এ সব মতের মূল্য নেই। শুধু লঘু কথা, কৃত্রিম বোলচাল, অলীক ভড়ং নিয়ে কোন তত্ত্ব সৃষ্টি করা চলে না। গান্ধীজীর কোন গ্রন্থে সামান্য ভাবেও তিনি কোন তুরীয় তত্ত্বের বা সত্যের সাক্ষাৎকার করেছেন এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। যে সাক্ষাৎকারের জন্য অরবিন্দ গুহাকন্দরে নিভৃত তপস্যায় আত্মবলি দান ক'রেও এখনও কোন সীমান্তে উপস্থিত হ'তে পারেন নি—রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণ সামান্য আলোরেখার পশ্চাতে ছুটে 'মা' 'মা' রবে এক সময় মূর্চ্ছিত হয়েছেন—ওয়ার্দ্ধাচক্রের ঢিলে পায়জামা ও চটি-পরা প্যাটেল, রাজেন্দ্র ও জহরের করতালির সহায়তায় কি গান্ধীজী তা দিতে সাহসী হয়েছেন? ভারতবর্ষ মৃত বলে' এসব সম্ভব হচ্ছে।

গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়ে' আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এতটা জীবন সম্পৃক্ত বর্ব্বর দৃষ্টি কি এ যুগে সম্ভব? কি করে' আধুনিক ভাষায় এ সব শরীরগত অসূক্ষ্ম ভাষণ সম্ভব হ'ল? গুজরাট ও হিন্দুস্থানী জগতের পেছনে কি সংযম ও মার্জ্জিত রুচি নেই? কোন বিরাট সাহিত্য, কোন মহান্ অনুভূতি কি এ সব স্থূলরুচি ও অপাঠ্য প্রেরণাকে শৃঙ্খলিত করতে পারেনি? উত্তর-পশ্চিমাদি

দেশের সভ্যতা ও শীলতার (Culture) পশ্চাতে আছে মাত্র এক তুলসীদাসী রামায়ণ—আর কিছুই নয়! গুজরাটী সাহিত্যের দানের অকিঞ্চিৎকরত্ব কি এজন্য দায়ী! এর ভিতর শৈব সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য, বৈষ্ণব সাহিত্যের সূক্ষ্ম কারুতা বা আধুনিক রসসাহিত্যের বিচিত্র দীপালী খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এসব বাঙলা দেশকে ও চিন্তাকে বারবার সমৃদ্ধ করে' দেশের চিন্তা ও ব্যবহারকে মার্জ্জিত করেছে।

এরূপ অবস্থায় বেশী আশা করা বৃথা। ভারত মোটা কাপড়, মোটা চাল, মোটা কথা মাত্র সৃষ্টি করেনি। এ দেশে মস্‌লিন ও কিংখাব হয়েছে—রেশম ও পশমের যাদু এদেশ ভোগ করেছে। কাজেই চরকার আওয়াজ বা গরুরগাড়ীর অভিভাষণই ভারতীয় তত্ত্বের প্রতিফলক নয়।

তবে একটা বিষয়ে গান্ধীত্বের মৌলিকতা স্বীকার্য্য—আর সব অর্থাৎ অহিংসাবাদ প্রভৃতি—পুরানো ব্যাপার। সে সব বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও চৈতন্য প্রভৃতির দান। গান্ধীজই জগৎকে আত্মহত্যা যে একটা পুণ্যের ব্যাপার এবং সেজন্য সামাজিকভাবে কাগজ-পত্রের সাহায্যে বাদ্যোদ্যম করার চেষ্টা যে প্রশংসার ব্যাপার তা' দেখিয়েছে। গান্ধীজী দু'তিনবার আত্মহত্যার পবিত্র চেষ্টা করেছেন। জগতের ইতিহাসে অন্ততঃ এই ব্যাপারটি নূতন—একথা স্বীকার করতেই হবে।

সীমান্তে

জ্যোতির্ময় রায়

সর্বনাশ এ যে সাপ!

মণিকান্ত তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। সাপ ততক্ষণে প্রতিঘাত করিয়া বসিয়াছে। রাস্তার-বাতির ক্ষীণালোকে মণিকান্ত বেশ দেখিতে পাইল সাপটা মোচড় খাইয়া ঝাপ্‌টা মারিয়া রাস্তার ঢালু কিনারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ছোবল মারিয়াছে ডান-পায়ের জুতার কিছুটা উপরে; মণিকান্ত বসিয়া পড়িয়া ক্ষতস্থানের উপরটা প্রাণপণ শক্তিতে দু-হাতে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সাপ! সাপ!

সহরের এ অংশটা এমনিতেই ফাঁকা, তার উপর রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে, রাস্তায় মণিকান্ত ছাড়া আর কোন লোকই ছিল না। ছেলেদের খেলার মাঠ পার হইয়া খান দুই বাড়ীতে মিটমিট করিয়া আলো জ্বলিতেছিল, চীৎকার শুনিয়া সেদিক হইতে দু'তিনজন লোক ছুটিয়া আসিল:। এক ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র ফাড়িয়া ক্ষিপ্রহস্তে মণিকান্তের পা হইতে উরুর মধ্যে চার আঙ্গুল শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল—মণিকান্ত তখন সংজ্ঞা হারাইয়া রাস্তার উপর এলাইয়া পড়িয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড বা সর্পাঘাতের খবর শুনিলে লোক 'দর্শক' হইবার জন্য উন্মত্ত আগ্রহে ছুটিয়া আসে: প্রথম ব্যাপারে দর্শকদের আন্তরিক ইচ্ছাটাকে সাধু বলা চলে না, অল্পেতে নিভিয়া গেলে পণ্ডশ্রম মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যায়; সর্পাঘাতের বেলায় অবিশ্যি অন্যরূপ, ছুটিয়া আসে ওঝাদের অদ্ভুত চমকপ্রদ প্রথায় জীবন ফিরাইয়া আনা দেখিতে—জীবন ফিরিলেই সম্বন্ধন মৃত ব্যক্তির পক্ষে লাভ, অতএব উদ্দেশ্য মহৎই বলিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় হইবার মত কিছু একটা কাজ করিয়া মৃত্যুকালে যে আন্দাজ লোক জড়ো করা সম্ভব হয় তার দশগুণ আসিয়া জোটে সাপে কাটিলে: দেখিতে দেখিতে মণিকান্তর ঘর, বাড়ী, আঙিনা ও রাস্তা লোকে ভরিয়া গেল।

মণিকান্তের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। অকূল বিস্মৃতির মাঝে ছোট্ট একখণ্ড দ্বীপের মত তার অনুভূতির মধ্যে ভাসিয়া উঠিল উজ্জ্বল আলো, ঝুঁকিয়া-পড়া কতকগুলি মাথা, চলা-ফেরার শব্দ, মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ও কথাবার্তা। ক্রমে সেই খণ্ড-অনুভূতি ব্যাপ্ত হইয়া তার পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিল: তাকে সাপে কামড়াইয়াছিল, সে মরিয়া গিয়াছিল—তবে কি এই মাত্র সে বাঁচিয়া উঠিল! মণিকান্ত ধড়ফড়াইয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করে; পায়ে তার অসহ্য যন্ত্রণা, হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখে বাঁধুনিগুলি তখনও ঠিক তেমনি আছে—মণিকান্ত বুঝিতে পারে সে চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছে, জীবন ফিরিয়া পায় নাই।

ঘর-ভরা লোক। সামনে দাঁড়াইয়া আছেন তার দাদা, মা পাশে বসিয়া বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছে, ঐ যে তার ছেলেমেয়ে মণ্টু আর বুলু, মণিকান্ত হাত দিয়া তাহাদের কাছে

ডাকিল। কিন্তু রাণী, রাণী কই! চোখ তুলিয়া শিয়রের দিকে চাহিতেই চোখোচোখি হইল, মণিকান্তের চোখ দিয়াও জল গড়াইয়া পড়িল। এক হাতে ভর করিয়া কাত্ হইয়া বসিয়া মণিকান্ত তার দাদাকে বলিল, দাদা আমাকে বাঁচান—বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

—কিচ্ছু ভয় নেই তোর মণি, ডাক্তারবাবুরা, কবিরাজমশাই—সবাই আছেন, ওঝা আনতে পাঠিয়েছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলিতে না বলিতেই বিশু কর্মকার আসিয়া হাজির। সহরের মধ্যে একমাত্র ওঝা বিশু। এ তল্লাটে নাম-করা ওঝা কলাকোপার মদন মাঝি, সে থাকে মাইল ছয় দূরে; অনেকক্ষণ হয় তাহাকে আনিতেও লোক চলিয়া গিয়াছে। বিশু কর্মকার আগাইয়া আসিতেই ডাক্তার কবিরাজ সকলে সরিয়া দাঁড়াইল—উন্নত, সমৃদ্ধ বিজ্ঞান অক্ষমতার লজ্জা লইয়া কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া বিশেষ কিছু যে করিতেছিল এমনও নয়। সামান্য দু-একটা প্রয়োজনীয় বস্তু চাহিয়া লইয়া বিশু তার ঝাড় ফুঁক-বিড়বিড় করিয়া সুরু করিয়া দিল।

মণিকান্ত কোর্টে কাজ করে, তাই খবর পাইয়া মুন্সেফবাবু আসিলেন দেখিতে। মফস্বলের মুন্সেফবাবু—মণিকান্তের দাদা অনন্তবাবুএরই মধ্যে একবার 'আসুন, বসুন' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। 'থাক থাক' বলিয়া তিনি আসন অভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মণিকান্তের চোখের দিকে চোখ পড়িতে বুকটা তাঁহার কেমন করিয়া উঠিল। মরিবার পূর্বে চোখে চোখে চাহিয়া লোকটা অভিশাপ না দিয়া বসে। মণিকান্তকে তিনি ভাল চোখে দেখিতেন না, তাহার উপর দিন দুই পূর্বে সামান্য একটা অপরাধের জন্য পাঁচটাকা জরিমানা করিয়াছেন। মুন্সেফিত্ব ছাড়াইয়া সারজজীতে পদার্পণ করিবার বয়স হইয়াছে, তা ছাড়া ছেলে-পুলের সংসার—মনটা তাঁহার খুঁৎখুঁৎ করিতে থাকে।

অপেক্ষমান সকলকে নিরাশ করিয়া বিশু বলিয়া বসিল, আমার কম্ম না, ওস্তাদ আসুক।

গুরুত্ব বুঝিয়া আবার একটা কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

মণিকান্ত বিচ্ছিন্নভাবে বলিতে লাগিল, মা···দাদা···। রাণীকে সে কাছে টানিয়া বসাইল। মণ্টু-বুলু কাছে সরে' আয়···দাদা আমাকে তোমরা বাঁচাতে পারলে না···

অনন্তবাবু সিক্ত চোখে ভাইয়ের মাথায় হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সেফবাবু হয়তো অন্তিমদৃষ্টিতে একটা শুভেচ্ছা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাতেই পদোচিত কর্তৃত্বের সুরে বলিলেন, আমরা যখন রয়েছি সব চেষ্টাই একবার করে' দেখবো, আপনি এত অস্থির হবেন না।

মণিকান্ত মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, অস্থির হ'ব না···আপনি কি বুঝবেন মশাই···দাদা, এ ছেলে-মেয়ে দু'টোকে রেখে গেলাম···আর রাণী···

—তুই এ সব বলিস নে মণি—মা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

—কান্না রাখো, শোনো যা বলছি···বৌদি কই,—বৌদি, রাণী-ওদের তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম, দেখো। দাদার দিকে চাহিয়া বলিল, ইন্‌সিওরের হাজার পাঁচ টাকা পাবে রাণী,

আর—মণিকান্ত একবার থামিল, একটু যেন দ্বিধা করিল,—আর এই বিশু কর্ম্মকারের কাছে চারশো টাকার গয়না গড়াতে দিয়েছি, সেটা বুঝে নিও...

কথাটা যেন অনন্তবাবুর কানে গিয়া আঘাত করিল। আজ প্রায় এক বছর হইতে চলিল মণিকান্ত কি একটা দেনা শোধের নাম করিয়া সংসারে বরাদ্দ টাকার মাত্র অর্দ্ধেক দিয়া আসিতেছে।

সাপে কাটার খবর শোনামাত্র ছুটিয়া যাওয়া ওঝাদের গুণধর্ম্ম, নচেৎ মণিকান্তের এ-বিপদে রসিদহীন দায় স্বীকার করিবার বিপদ ঘাড়ে করিয়া বিশু কর্ম্মকার উপস্থিত হইত কিনা বলা কঠিন।

মণিকান্ত কথার মাঝখানে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিল—নাঃ আর পারিনে, বাঁধুনি-ছুঁছুনি দিন খুলে, একটু শান্তি তো পাব...ও গয়না আর রাণীর গা'য় উঠলো না...এমন-ই হয়...

মদন মাঝি,মদন মাঝি, বলিয়া একটা রব পড়িয়া গেল। মদন মাঝি আসিয়াছে। সকলে এবার রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল একটা অদ্ভুত কিছু দেখিবার জন্য। মদনের অত্যাশ্চর্য্য-ক্ষমতা-প্রচারকারী গল্প কাহারও নিকট অনবিদিত নয়: এখনই চোখের সামনে দেখিতে পাইবে কেমন করিয়া মদনের মন্ত্রপূত কড়ি হাঁটিয়া চলিয়া যায় এবং ফিরিয়া আসে সগৌরবে সাপের মাথায় সওয়ার হইয়া; কেমন করিয়া মদনের আদেশমত বিষ চুষিয়া ঢালিয়া দেয় দুধের বাটিতে।

মদন কিছুক্ষণ ধরিয়া ক্ষতস্থানের সামনে বসিয়া কি যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তারপর ঐতগুলি লোকের চমৎকৃত হইবার বাসনাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া বলিয়া বসিল, আরে তো ঢোঁরা সাপের কামড় এনা, কাট, কাট এই হগল দড়িদড়া...

নানাপ্রকার মতানৈক্যের মধ্যে জোর করিয়াই মদন মাঝি বাঁধন কাটিয়া দিল। স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই বোঝা গেল, মদন ভুল করে নাই।

...এবার মণিকান্তের লক্ষ্য পড়িল—সামনে দাঁড়াইয়া আছেন তার বড়কর্ত্তা মুন্সেফবাবু, পাশেই তার দাদা ও বিশু কর্ম্মকার...ঘরভরা লোকের সামনে এখনও সে রাণীর মাথাটা বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া আছে—

হাতটা মণিকান্ত শিথিল করিয়া দিল। মাথায় হাওয়া দিতে ইঙ্গিত করিয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া সে শুইয়া পড়িল।

মরিয়া যাইবে মনে করিয়া এতক্ষণ সে যা বলিয়াছে এবং করিয়াছে বাঁচিয়া গিয়া তাহারই জন্য তার মরিতে ইচ্ছা হইল।

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জয়ন্তর বাবা ভারত-সরকারে একটা বড়রকমের চাকরী করেন—বড়রকমের মানে আয়ের অঙ্কটা স্থূল আকারের। উপস্থিত কলকাতায় এসেছেন কিছু দিন হ'লো—কে জানে আবার হয়ত চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে তাঁকে সিমলা-দিল্লী টানা-হেঁচড়া করতে হবে—এমনি একটা অশুভ আতঙ্কে জয়ন্তর বাবা মিঃ দে সব সময় সঙ্কুচিত থাকেন। কলকাতায় এসে তিনি নিশ্চিন্ত। 'আঃ বাঁচলাম'—এমনি একটা ভাব।

জয়ন্তর কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে একদিক দিয়ে,—বাড়ীর সাহেবীয়ানার সঙ্গে তার রুচির সামঞ্জস্য নেই। তবু এখানেই তাকে থাকতে হয় অনেক সময়—বাড়ীর শাসনও যথাসম্ভব মেনে চলতে হয়। বাড়ীতে তারা দু'টি ছেলে মেয়ে, জয়ন্ত আর তার বোন মন্দিরা।

মিঃ দে-র সংসারে বাহুল্য নেই। নিদ্দিষ্ট অনুশাসনে আর শৃঙ্খলায় তিনি এই সংসারটি গড়ে' তুলেছেন—কোথাও একটুও ফাঁক রাখেন নি।

জয়ন্তর কিন্তু এসব সহ্য হয় না। এত নিয়ম—পদে পদে ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেক কাজে রুটিন মেনে চলা আর ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা—জয়ন্তর একেবারেই পোষায় না।

অনিয়ম একরকম তার অভ্যাস হ'য়ে গেছে, মনের খুসিতে যেখানে সেখানে সে যেতে পারতো—সময় তার কোনদিন গতিরোধ করে নি—বাধাবন্ধহীন উদ্দাম জীবনস্রোত। জয়ন্ত এর আগে কোন দিকে তাকায় নি। তবু তাকে থামতে হ'লো অনেকটা, ভাবতে হ'লো পিছনের দিক। কৃষ্ণার সঙ্গে হস্টেল পর্য্যন্ত সে অনায়াসে যেতে পারতো—রোজই ত সে যায়। বাড়ীর কথা একবার তার মনে হয়েছিল, রাত হ'লো,—কিন্তু সেইটুকুই সব নয়।

সে ত জানতো সব, তবু সে একবার কৃষ্ণার মুখে শুনতে চেয়েছিল, তাই তার ভাল লাগলো না যখন সে প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করলে, আর যখন জয়ন্তর কাছ থেকেই সে-কথা আদায় করা হলো যে-কথা কৃষ্ণার অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। জয়ন্তর কিছু ভাল লাগছিল না।

একটু আগে সে অনুভব করেছে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-স্পন্দন আর অপর্য্যাপ্ত উচ্ছলতা। অনির্ব্বচনীয় রাত্রির স্বাদ কবিতার মত, নেশার মত তাকে আচ্ছন্ন করে' রেখেছিল, আর একটু পরে মৃত্যুর মত অসাড় শীতল শুব্ধতায় মুহূর্ত্তগুলো গড়িয়ে যেতে লাগলো। জয়ন্ত লক্ষ্য করে' দেখলে, আকাশে চাঁদ নেই। ইজিচেয়ারে শুয়ে জয়ন্ত মনে করার চেষ্টা করছিল কাল কত রাত্রে সে বাড়ীতে ফিরেছে!

কিছুই তার মনে পড়ে না, স্নায়ুগুলো অবসাদে আচ্ছন্ন। 'বয়' এসে জানালে চায়ের টেবিলে সবাই তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। জয়ন্ত তার চা উপরের ঘরে দেবার জন্য হুকুম করলে।

মন্দিরাকে নিয়ে মিঃ দে-র চিন্তার শেষ নেই। কেন যে সে দিন-দিন স্থূল হ'তে স্থূলতর আকার ধারণ করছে! মিঃ দে সম্ভব-অসম্ভব অনেক রকম চেষ্টা করছেন তাকে নিয়ে। সন্ধ্যা হ'লেই তিনি স্কিপিং রোপ হাতে নিয়ে 'বেবি' বলে চীৎকার করবেন। আর মন্দিরাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অভ্যাসের পরীক্ষা দিতে হবে, অমান্য করবার উপায় নেই। সকালবেলায় ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে মিঃ দে বলবেন 'start' আর বেবি মানে মন্দিরা সমস্ত মেঝেতে রোল করতে সুরু করবে।

খাদ্য থেকে কার্বোহাইড্রেট যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে, তবু প্রতিদিন যত ক্যালোরি উত্তাপের সৃষ্টি হয় সবই কি মন্দিরা কাজে লাগাতে পারে?

মিঃ দে চিন্তিতমুখে বিচার করতে বসেন—উন্নতি যে কিছুই হচ্ছে না, এটা তিনি বেশ বুঝতে পারেন।

মিসেস দে বলেন, 'তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি—মেয়েটাকে কি বাঁচতে দেবেনা?'

মিঃ দে চশমাটা খুলে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেন, 'কেন? কি হয়েছে?' তাঁর ভয়, হয়ত নিয়ম পালনে কোথাও ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

'সপ্তাহে দু'দিন 'ফাস্ট্' করলে ওর শরীরে কি থাকবে শুনি?'

'সব বাঁদ দিয়ে যা থাকবে তাতেই ওকে সুন্দর দেখাবে। ওর শরীরে যা চর্ব্বি আছে দুদিন কেন, সাতদিন না খেয়ে থাকলেও ওর কিছু হবেনা, দেখো।'

'পুরুষ মানুষ, তোমাদের আর কি! মেয়েটা খায় না, আমারও আর কিছু মুখে দিতে ভাল লাগেনা।'

'Sentiments!' মিঃ দে পাইপটা মুখে লাগালেন।

উচ্ছ্বসিত কথার স্রোতে একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, খানসামাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে—এখানে সেখানে ছুটোছুটি করছে। বাড়ীর আবহাওয়ায় একটা খুসির আমেজ। শাসনের রাশ যেন একটুখানি শিথিল, কয়েক মুহূর্ত্ত যে যা ইচ্ছা করো—যা খুসি ভাবো, কারও কিছু বলবার নেই।

জয়ন্তর একটু অদ্ভুত লাগছিল। তার মনে হলো, তার বাবা বোধ হয় কোথাও বদ্‌লি হলেন—'ফোনে' হয়তো সেই খবরই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আর কী হতে পারে? তাছাড়া আরও অনেক কিছু হ'তে পারে জয়ন্ত যা জানতো না।

বেবি একটা কেক কামড়াতে-কামড়াতে উঠে এলো। চেয়ারে একটা শব্দ করে' বসেই বললে, 'মেজদা, দু'পাউণ্ড।'

এই ঠাণ্ডাবাতাসেও বেবি ঘামতে সুরু করেছে। জয়ন্ত ফ্যানটা খুলে দিয়ে বললে, 'দু'পাউণ্ড মানে? Crossword Puzzle নাকি?' মন্দিরা প্রায়ই crossword নিয়ে কসরৎ করতো।

Puzzle-ই বটে। এত কৃচ্ছ্র সাধনে, এত দিনের পরিশ্রমে মোটে দু'পাউণ্ড weight কমলো

একটা দ্রুত নিঃশ্বাসপতনের শব্দ শোনা গেল। 'But that is a good sign.' জয়ন্ত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'এখন proportion ঠিক রাখতে পারলে হয়।' মন্দিরা একটু চেষ্টা করে' হাসলে।

জয়ন্ত চেয়ে ছিল আকাশের দিকে।—মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রের যদি একটু আভাষ পাওয়া যায়। কী ক্লান্তিকর এই দিনগুলো! পায়ের কাছে রোদ সরে' এসেছে। জয়ন্ত এইবার উঠে দাঁড়াল।

জয়ন্ত বারান্দায় এসে বললে, 'বেবি একটু স্কিপিং কর্‌বি?' হাতের অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট প্রায় নিভে এসেছে।

'ঠাট্টা? আমাকে তুমি কি ভাবো বলো ত?' উত্তেজনায় মন্দিরার চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। একটু থেমে আবার বললে, 'এই দুপুর রোদে কেউ স্কিপিং করে?' মন্দিরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছিল, জয়ন্ত তাকে বাধা দিয়ে বললে—'তোর বুদ্ধিটা এত স্থূল হচ্ছে দিন দিন, কোন কথাই তুই বুঝ্‌তে পারিস না।'

মন্দিরা ভুরু সঙ্কুচিত করে' বল্‌লে, 'তুমি আমায় স্কিপিং কর্‌তে বলোনি?—এটা ঠাট্টার মত শোনায় না?'

'না শোনায় না। কোনো কথা ঠিক বুঝ্‌তে পারবি না অথচ তর্ক কর্‌বি?' মন্দিরা গুম হয়ে বসে' রইলো। জয়ন্ত তার চেয়ারের হাতলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে' বল্‌লে, 'বেবি রাগ কর্‌লি?'

মন্দিরা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে, 'তুমি কি মনে করো আমার চেয়ে কেউ মোটা নেই? কাল যিনি বেড়াতে এসেছিলেন তাঁকে ত তুমি দেখ নি?'

'আমার দুর্ভাগ্য!' জয়ন্ত তার নিজের চেয়ারে ফিরে এলো। তার মনে হ'ল সে যেন অনেকটা সহজ হ'তে পেরেছে, কথার কাটাকাটিতে অবসাদ আর ক্লান্তি যেন ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

'দুর্ভাগ্য ত বটেই! কেননা মহিলাটি বিশেষ করে' তোমার কাছেই এসেছিলেন।' মন্দিরা বল্‌লে—'কোনদিন দেখিনি আমরা,—মা ত রীতিমত অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী, এ-কথা সে-কথার পর বল্‌লেন, আমাদের মামার বাড়ীর সঙ্গে তাঁর জায়ের কি একটা সম্পর্ক আছে—জায়ের ছেলে এখন ওয়েলস্-এ—তার খবর না পেয়ে ওঁরা খুব ভাবছেন। যাবার সময় বল্‌লেন, কোনদিন ত দেখাশুনো নেই, আত্মীয়স্বজন যাওয়া আসাতেই আপনার; নইলে আর কী? গরীবের বাড়ীতে কাল একবার পায়ের ধুলো দেবেন। জয়ন্তকে দেখতে পাচ্ছি না, ওকেও একবার বল্‌বেন। অনেকদিন ধরে' বড় একটা যায় না।—কে জানে কী হল! বেশ ছেলে আপনার, এমন অমায়িক! তারপর অনেকক্ষণ ধরে' তোমার প্রশংসা চল্‌লো—'

জয়ন্ত খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলো; তারপর বল্‌লে, 'এর আগেও আর এসেছিল নাকি?'

'কী করে' জান্‌বো বলো! ওঁরা এলগিন রোডে থাকেন।'

'তা জানি,' জয়ন্ত বল্‌লে।

'তাহলে তুমি আজকে আমাদের নিয়ে যাবে—কি বলো?'

'মোটেই নয়।'

'বা-রে, সেটা কী ভাল দেখায় নাকি? মা যাবেন না, আমরা যাবো না—আমরা মানে তুমি বিশেষ করে'—আমি ত সঙ্গে নেহাৎ না গেলে নয় তাই যাবো—'

'বেশ ত, আমিও যাবো না, তা হলে তোমার যাবার দরকার হবে না আশা করি।'

'তাই বুঝি হয়—কী যে বলো তুমি।' মন্দিরা প্রায় বিগলিতকণ্ঠে বল্‌লে।

জয়ন্ত কি রকম যেন সঙ্কোচ অনুভব করলে। হেমলতাকে সে জান্‌তো,—নাকি সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে হয়ত ব'ল্‌তে সুরু করবেন: তোমার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল জয়ন্ত,—রমলা বল্‌ছিল—। রমলা হয়ত কিছুই বল্‌ছিল না এবং কোনদিন বল্‌বেও না। তবু হেমলতা খুসিতে বিগলিত হয়ে আরম্ভ করবেন। পানের রসে ঠোঁটটা রঞ্জিত করে' দোক্তার কৌটোটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে হেমলতা বল্‌বেন: রমলা বল্‌ছিল, কলেজে ওর একটুও পড়া হয় না—কিছু যেন বুঝ্‌তে পারে না—তুমি যেমন পড়াও—আর কেনই বা হবে না? এতগুলো পাশ দেওয়া কী সহজ নাকি!

একরাশ প্রশংসা আর উচ্ছ্বাস।

এসব কথা হেমলতা রমলার সাম্‌নেই বল্‌বেন। কোথাও একটুও ফাঁক না থাকে,—আর জয়ন্তকে বাধ্য হ'য়ে ঢুকতে হবে রমলার পড়ার ঘরে নিজেকে অনেকটা সঙ্কুচিত করে'—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে পার হ'য়ে যাবার সঙ্কল্প নিয়ে। রমলা ছাপার অক্ষরের দিকে চোখ রেখে মাথা নীচু ক'রে' বসে' থাকবে—পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির শীতলদৃষ্টি। কোন উত্তাপ নেই। জয়ন্ত প্রথম প্রথম দু'একটা প্রশ্ন করেছে—তারপর আর তার কোনদিন উৎসাহ হয়নি।

হেমলতা কিন্তু কোনদিন তাকে একটুও নিঃশ্বাস ফেল্‌তে দেন নি—সমস্ত সময় সতর্কদৃষ্টির অনুসরণ। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লে মেয়েকে ধমক দিয়ে গেছেন কিম্বা হয়ত এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকে বলেছেন, একটু গলাটা ভিজিয়ে নাও। কী গাধার খাটুনি তোমার, মেয়েটাকে এত বলি একটু মন দিয়ে পড়,—এই দেখো না সন্ধ্যের সময় ঘুমে ঢ'লে' পড়ছে।

রমলার চোখে ঘুম নেই; কিন্তু সে যে জেগে আছে তাও তাকে দেখে বোঝা কঠিন।

—এমনিভাবে কাট্‌বে অনেকক্ষণ। হেমলতার কৌতূহল! এটা-ওটা কত কথাই না জিগ্‌গেস করবেন। শান্ত বালকের মত জয়ন্ত সব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

হেমলতা পা ছড়িয়ে বসে' সল্‌তে পাকাতে সুরু করবেন। আরতি মাথায় তেল মালিশ করবে। আর জয়ন্ত ছায়ার মত সরে' আস্‌বে পাছে হেমলতার ঘুম ভাঙে।

সদর দরজার কাছে এসে রমলা একবার চোখ তুলে তাকাবে—ক্লান্ত, করুণ চোখ। অনুনয়ের স্বরে হয়ত বল্‌বে, কালকে কী আস্‌তে পারেন একবার?

জয়ন্ত হয়ত অন্যমনস্কভাবে বল্‌বে, কী জানি! বোধ হয় হ'য়ে উঠ্‌বে না।

সমস্ত পথ রমলার বিষাদ-মলিন মুখখানা তাকে অনুসরণ করবে।

যাবার সময় এমন করুণভাবে রমলা ওকথা বল্‌বে, জয়ন্তকে আস্‌তেই হবে বাধ্য হ'য়ে।

পরিচিত হবার পর, হেমলতা এমনি করে' দিনের পর দিন তাকে ঘনিষ্ঠ করে' তুল্‌ছেন।

ক্রমশঃ

সম্পাদকীয়

বার্ণার্ড শ' ও চেম্বারলেনীয় নীতি

কয়েকদিন আগে মিঃ বার্ণার্ড শ' বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের যুদ্ধ-সম্পর্কিত একটি বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, হিটলার, ষ্টালিন, মলোটোভ প্রভৃতির বক্তৃতা পড়ে' বিষয়টা যেমন অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, মিঃ চেম্বারলেনের বক্তব্য তেমন সহজ ও স্বচ্ছ হয় না। অর্থাৎ, বক্তব্যকে অত্যন্ত সহজ ও সরল করে' বলবার যে-ক্ষমতা হিটলার, ষ্টালিন, মলোটোভ প্রভৃতির আছে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর তা' নাকি নেই! মিঃ শ' বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই অক্ষমতার কোনো বিশদ সমালোচনা না করে' সরাসরি একটি প্রস্তাব করে' বসেছেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে: অবিলম্বে একটা পৃথক কাউন্সিল গঠন করা হোক্; এই কাউন্সিল হিটলার, ষ্টালিন প্রভৃতির বক্তৃতা শুনে রীতিমতো বিচক্ষণতার সঙ্গে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর রচনা করবেন এবং কোনো সুদক্ষ বক্তার দ্বারা তা' প্রচারের ব্যবস্থা করবেন। আসল উদ্দেশ্য, সেই বক্তা-প্রতিনিধি যেন স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করে' তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে পারেন।

কূট-ব্যঙ্গ-রসিক মিঃ শ' বৃটিশ প্রতিনিধির মুখ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য শুনবার জন্য হঠাৎ এতটা উতলা হ'য়ে উঠলেন কেন, এবং তাঁর এই প্রস্তাব পেশ করার পিছনে স্বভাবগত হেঁয়ালী ছাড়া আর কোনো গূঢ় রাজনীতিক রহস্য আছে কিনা বলা কঠিন। তবে, সম্প্রতি দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মানী বৃটিশ জাহাজগুলিকে নিয়ে অত্যন্ত সহজ ও সরল পদ্ধতিতে যে-জলকেলি সুরু করেছে, অন্তত তার প্রতীকার-চিন্তায় মিঃ চেম্বারলেন সন্ধি-কাসি ঝেড়ে-মুছে আবার মন্ত্রীসভায় এসে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। অবশ্য বর্ত্তমান পরিস্থিতিতেও চট্ করে' তিনি কোনো সোজা কথা সহজভাবে বলবেন কিনা সন্দেহ।

তবে, পৃথক কাউন্সিল গঠিত হোক্ আর নাই হোক্, ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার আপাতত যে কোনো পরিবর্ত্তন হবে না—এ-কথা শুনে' মিঃ শ' যদি নিরাশ হ'ন তাহ'লে বুঝতে হবে, স্পষ্ট কথা ছাড়াও অন্য-কিছুর জন্য তাঁর মন খুঁত-খুঁত করছে।

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে পরিবর্ত্তন

রাশিয়ার সাম্যবাদ সম্পর্কে সভয়ে আমরা যে-ধারণা পোষণ করে' আসছিলাম, এতদিন পরে তা' নিয়ে জোর-গলায় দু'কথা বলার সুযোগ এসেছে। সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের পরিচালকগণ দীর্ঘ বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এখন ক্রমশ উপলব্ধি করছেন যে তাঁদের পুরিকল্পিত সাম্যবাদ-নীতির কিছু-কিছু অদল-বদল একান্ত আবশ্যক।

প্রথম দিকে সাম্যবাদের যে-সব কঠোর নীতি রাশিয়ায় অবলম্বিত হয়েছিলো ধীরে-ধীরে তার অনেকগুলিই শ্রেণীগত স্বার্থ ও সুবিধাবাদের মোহমন্ত্রে শিথিল হয়ে এসেছে। সম্প্রতি

আরও প্রকাশ, বার্ষিক বিপ্লব-স্মৃতি অনুষ্ঠানের আগামী দ্বাবিংশ অধিবেশনে নীতিমূলক পরিবর্ত্তনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবে এবং সে-সময় সোভিয়েট শাসনতন্ত্র ঘোষণা করবেন যে, এর পর থেকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি রাখা চলবে, ব্যক্তিগতভাবে সকলেই চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে, শিল্প-সম্বন্ধীয় কলকারখানা চালাতেও বাধা থাকবে না। তবে, কেউ কোনো ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশজনের বেশি শ্রমিক খাটাতে পারবে না।

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে সত্যি-সত্যি সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে কিনা তা' বিচার করুন স্বাধীন রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা—আমরা, পরাধীন ভারতবাসীরা, আপাতত না হয় রাশিয়ায় যে-সাম্যবাদের বীজ বপন করা হয়েছে তার শ্রেষ্ঠতম ফলগুলির মুখ তাকিয়ে থাকি!

ভারতের স্বাধীনতা ও কংগ্রেসের কর্ম্মপন্থা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিগত এলাহাবাদ বৈঠকে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা এই স্থিরীকৃত হয়েছে যে (১) সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানে গান্ধীজীর অখণ্ড নেতৃত্ব পরিপূর্ণভাবেই আবশ্যক। এবং এই সূত্রে কমিটির অতিবিচক্ষণ সদস্যগণ গান্ধীজীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর মহামূল্য নির্দ্দেশ তাঁরা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে' চলবেন এবং নিজেদের ভিতরকার দুর্ব্বলতা (কোনো বড়ো সমস্যা বা বড়ো চিন্তার মুখোমুখি হ'তে হ'লেই মনের ময়লা সাফ্ করার সাফাই গাওয়া গান্ধী-আনুগত্যের প্রথম ও চরম কৌশল) ধুয়ে-মুছে ফেলবেন। (২) বর্ত্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে আইন-অমান্য-আন্দোলন সুরু করার কোনো প্রয়োজন আপাতত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। (৩) কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকারের মধ্যে আপোষ-আলোচনার পথ সর্ব্বদাই খোলা থাকবে। (৪) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজন হ'লে শত-শত রাত্রি বিনিদ্র কাটাতে হবে।

এতগুলি কর্ম্মপন্থার প্রতিশ্রুতি পেয়েও যদি কোনো স্বাধীনতাকামী সন্দেহী প্রশ্ন করে, 'ভারত এবার স্বাধীন হবে ত?' আমরা নিঃসংশয়ে উত্তর দেব, 'আলবৎ হবে। এখনো ন'শো আটানব্বই বার হবে।'

ভারতের ভাগ্য ও জওহরলাল

কয়েক দিন পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 'ন্যাশন্যাল হেরাল্ড' পত্রিকায় 'কী উপায়ে ভারত স্বাধীন হ'তে পারে' প্রসঙ্গে বলেছেন যে, থিওরি নিয়ে মাথা ঘামাবার বা মাতামাতি করবার সময় আর আমাদের নেই। প্রতিমুহূর্ত্তে বিরাট কর্ম্ম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে—কর্ম্মের তাগিদ প্রতি কাজে।

ঐ একই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী আর এক জায়গায় বলেছেন, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অদৃষ্টে কি আছে, তা' এখন আমাদের ধ্যান-ধারণার বাইরে। আর বর্ত্তমানে তা নিয়ে বিব্রত হবার কোনও কারণ নেই। কারণ, ভারতের স্বাধীনতা-অর্জ্জনের পথ সুস্পষ্টভাবে স্থির-নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেছে। এবং সে-পথ অহিংসার পথ।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে মহাজনরা যে-পথ ধরে' যাবেন আমরাও নির্বিকারচিত্তে এবং দ্বিধাশূন্য মনে সে-পথে পা বাড়াবো সন্দেহ নেই। কিন্তু পণ্ডিতজী পাদ্রী সাহেবের মতো শুধু অহিংসার বাণী বিতরণ না করে' স্থির-নির্দ্দিষ্ট পথে প্রতিমুহূর্ত্তের বিরাট কর্ম্মের জন্য দু' পা এগুলেই ত আমরা পিছু নিতে পারি।

বন্দী-মুক্তি

বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যখন শাসনভার গ্রহণ করেন তখন বাংলার জেলগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা ছিলো ৪৫৭। বিনাসর্ত্তে ও সর্ত্তাধীন ভাবে এ-পর্য্যন্ত অধিকাংশ বন্দীই মুক্তিলাভ করেছে। এখন বাকী আছে মাত্র ৪০ জন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট একাধিক বিবৃতিতে ব্যক্ত করেছেন যে এই অবশিষ্ট বন্দীদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব।

নিছক যুক্তির দিক থেকে হয়তো এই 'কারণকে' আরও শক্ত করে' দেখানো যায়। কিন্তু, সেই করুণার মহিমাই ত মানব-সমাজে সব চাইতে প্রকটিত, যা' যুক্তি বা বিচারের নিক্তিকে ঠেলে' সরিয়ে রেখে নিঃস্বার্থভাবে প্রার্থিতের আবেদনে সাড়া দেয়। বাঙ্‌লার সহৃদয় মন্ত্রীমণ্ডলী এতগুলি বন্দীকে যখন মুক্তি দিলেন তখন বাকী ক'জনকে উদার অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত রাখেন কেন!

বাঙলায় জালমুদ্রার আধিক্য

এ-বছরের ১লা এপ্রিল থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসের হিসেবে প্রকাশ যে, বাঙ্‌লার গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারি, আইন-আদালত ও রেলওয়ে ষ্টেশন সমূহে জাল-মুদ্রার সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বৎসর ঠিক এই তিন মাসে বাঙ্‌লার অধিকাংশ জেলায় জাল-মুদ্রার সংখ্যা কম ছিলো। বর্ত্তমান বছরের এই তিন মাসে মোট ১০৬৭ টি জাল টাকা, ৬৯৫ টি জাল আধুলি, ৯৮৮ টি জাল সিকি, ২৫৩৫ টি জাল দু'আনি ও ১৬৮৩ টি জাল আনি পাওয়া গেছে।

উপরি-উক্ত জালমুদ্রার আধিক্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিজ্ঞান দিন-দিন যতই ত্রুটিশূন্য হয়ে প্রসার লাভ করছে, মানুষের দুষ্কৃতির উপায়-উদ্ভাবনের পন্থাও সেই পরিমাণে সুগম হচ্ছে। এই নৈতিক অধঃপতনের জন্যে মূলত বিজ্ঞানই যে দায়ী তা নয়, বাঙলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর শোচনীয় আর্থিক অনটনই এই ধরণের দুঃসাহসের পথ দেখায়। বাঁধা-ধরা আইনের দ্বারা চরিত্র-সংশোধনের ব্যবস্থা করার আগে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট যদি এর মূল কারণ সম্বন্ধে আন্তরিকভাবে অবহিত হ'ন তা'হলে এই মেকী-মুদ্রার প্রচলন যে নিশ্চয়ই কমতে থাকবে সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

নিখিলভারত হিন্দু মহাসভা

বহু আলাপ-আলোচনা ও আন্দোলনের পর বাঙলা সরকার অনুমতি দিয়েছেন যে আগামী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হ'তে পারবে। আপাতত স্থির হয়েছে যে, শ্রীযুত দামোদর সাভারকর এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন।

তুলনামূলক সুখ-সুবিধার আলোচনায় যদি এখানে কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ওঠে, তবে তা' থেকে নিরস্ত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তুলনাটি হচ্ছে এই, যে ইতিপূর্ব্বে এক রকম রাতারাতির আয়োজনেই ত এই কলকাতায় মুস্লিম লীগের এক বিরাট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো,

—তখন ত সরকার বাহাদুরকে অনুমতি দেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে একটুও বিব্রত হ'তে দেখা যায় নি।

এ বছরের নোবেল প্রাইজ

এ-বছর সাহিত্যের নোবেল-প্রাইজ পেয়েছেন ফিন্‌ল্যাণ্ডের মঃ ফ্রান্স ই সিলানুপা। ফিন্‌ল্যাণ্ডের অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ফিন্‌ল্যাণ্ডের কৃষক-জীবন সম্পর্কিত সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে সাহিত্যিক-কীর্ত্তির এই উচ্চতম শিখরে এনেছে। মঃ সিলানুপার লিখিত বই-এর সংখ্যা খুবই কম। তাঁর 'Meek Heritage' ও 'Falls Asleep While Young' নামক বই দু'খানি ও-দেশের পাঠক-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। আলেকজাণ্ডার ম্যাটসন্ "Meek Heritage" ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন। ছোটগল্পেও মঃ সিলানুপা অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

বর্ত্তমান বৎসরে রসায়ন-শাস্ত্রে নোবেল-প্রাইজ পেয়েছেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুটেনাণ্ডেট এবং জুরিকর অধ্যাপক রুজিকা। ১৯৩৮ সালে রসায়ন শাস্ত্রের নোবেল প্রাইজ কাউকে দেওয়া হয় নি—এ-বছর হিড্‌লেবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুন্ সে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্নেষ্ট অরল্যাণ্ড লরেন্সকে এ-বছর পদার্থবিদ্যার নোবেল-প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। ইনি সম্প্রতি পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র—'সাইক্লোটোন্' আবিষ্কার করেছেন।

পরলোকে দীনেশচন্দ্র সেন

গত ২০শে নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় প্রবীণ সাহিত্যিক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৩ বৎসর।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থ তাঁর আজীবন সাহিত্যসাধনার শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলে শিক্ষকতাকালীন তিনি এই বইখানি রচনা করেন এবং ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইখানি রচনার জন্য তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ থেকে গভর্ণমেণ্টের নিকট হ'তে আজীবন মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুনজর যাঁদের উপর পড়েছিলো—দীনেশচন্দ্রও ছিলেন সেই সৌভাগ্যবানদের অন্যতম একজন। সাহিত্যসেবার পুরস্কার হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্ণমেণ্ট তাঁকে যথাক্রমে ডি. লিট. ও রায় বাহাদুর উপাধি দিয়েছিলেন।

সম্পাদক : বিরাম মুখোপাধ্যায়

১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭১।১, পটুয়াটোলা লেনের 'ইণ্ডর প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : বিরাম মুখোপাধ্যায়